وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

# মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

●৬ষ্ঠ বর্ষ●৯ম সংখ্যা ●জুলাই ২০২২

Web : www.al-itisam.com

“ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামানের লোকেরা হজ্জ করতে আসত, কিন্তু সাথে পাথেয় (খাদ্য-পানীয়) নিয়ে আসত না। আর বলত, আমরা তো (আল্লাহর উপর) ভরসা করি। তারপর যখন মক্কায় এসে পৌঁছাত, তখন মানুষের কাছে খাবার চাইত। তখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন, ‘তোমরা পাথেয় সাথে নাও। কেননা তাকওয়াই হলো সর্বোত্তম পাথেয়’ (ছহীহ বুখারী, হা/১৫২৩)।”

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة:٦، ذو القعدة ١٤٤٣ هـ / يونيو ٢٠٢٢م العدد: ٨، الجزء: ٦٨
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف
التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

**Monthly AL-ITISAM**
Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;
Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

**প্রচ্ছদ পরিচিতি**

**মোহাম্মাদ নাসের আল-সালাফ মসজিদ, কুয়েত :** কুয়েত সিটির রাস আল-সালমিয়া এলাকায় অবস্থিত মসজিদটি ১৯৮১ সালে নির্মিত হয়। মসজিদটিতে ৫০ মিটার উঁচু একটি মিনার রয়েছে। 'পিরামিড মসজিদ' নামে পরিচিত অনিন্দ্য সুন্দর মসজিদটি এলইডির সাহায্যে তার রং বদলাতে পারে। ৭৮০ বর্গমিটার আয়তনের বিশাল মসজিদটিতে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ও একটি ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে।

## পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

### হিজরী ১৪৪৩ || ঈসায়ী ২০২২ || বঙ্গীয় ১৪২৯

| ইংরেজি মাস | আরবী মাস | বার | সাহারী শেষ ও ফজর শুরু | সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ | যোহর | আছর | ইফতার ও মাগরিব শুরু | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ জুলায় | ০১ যুলহিজ্জাহ | শুক্রবার | ০৩:৪৭ | ০৫:১৪ | ১২:০২ | ০৩:২১ | ০৬:৫০ | ০৮:১৭ |
| ০৫ ,, | ০৫ ,, | মঙ্গলবার | ০৩:৪৯ | ০৫:১৬ | ১২:০৩ | ০৩:২২ | ০৬:৫০ | ০৮:১৭ |
| ১০ ,, | ১০ ,, | রবিবার | ০৩:৫২ | ০৫:১৮ | ১২:০৪ | ০৩:২৪ | ০৬:৫০ | ০৮:১৬ |
| ১৫ ,, | ১৫ ,, | শুক্রবার | ০৩:৫৫ | ০৫:২০ | ১২:০৪ | ০৩:২৫ | ০৬:৪৯ | ০৮:১৪ |
| ২০ ,, | ২০ ,, | বুধবার | ০৩:৫৮ | ০৫:২২ | ১২:০৫ | ০৩:২৬ | ০৬:৪৭ | ০৮:১২ |
| ২৫ ,, | ২৫ ,, | সোমবার | ০৪:০১ | ০৫:২৪ | ১২:০৫ | ০৩:২৮ | ০৬:৪৬ | ০৮:০৯ |

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

## জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

### ঢাকা বিভাগ

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|
| গাজীপুর | -১ | ০ | +১ |
| নারায়ণগঞ্জ | +১ | +১ | ০ |
| নরসিংদী | -১ | -১ | ০ |
| কিশোরগঞ্জ | -৩ | -২ | ০ |
| টাঙ্গাইল | +১ | +২ | +৩ |
| ফরিদপুর | +৩ | +৩ | +২ |
| রাজবাড়ী | +৪ | +৫ | +৫ |
| মুন্সিগঞ্জ | +১ | +১ | -১ |
| গোপালগঞ্জ | +৫ | +৫ | +১ |
| মাদারীপুর | +৩ | +৩ | ০ |
| মানিকগঞ্জ | +২ | +২ | +২ |
| শরিয়তপুর | +২ | +২ | -১ |

### ময়মনসিংহ বিভাগ

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|
| ময়মনসিংহ | -৩ | -১ | +২ |
| শেরপুর | -২ | -১ | +৫ |
| জামালপুর | -১ | ০ | +৫ |
| নেত্রকোনা | -৪ | -৩ | +২ |

### চট্টগ্রাম বিভাগ

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|
| চট্টগ্রাম | -১ | -২ | -৮ |
| কক্সবাজার | +১ | ০ | -১১ |
| খাগড়াছড়ি | -৪ | -৪ | -৭ |
| রাঙ্গামাটি | -৩ | -৪ | -০৯ |
| বান্দরবান | -২ | -৩ | -১০ |
| কুমিল্লা | -২ | -২ | -৪ |
| নোয়াখালী | +১ | ০ | -৩ |
| লক্ষীপুর | +১ | +১ | -২ |
| চাঁদপুর | +১ | +১ | -২ |
| ফেনী | -১ | -২ | -৫ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | -৩ | -৩ | -২ |

### সিলেট বিভাগ

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|
| সিলেট | -৯ | -৮ | -৩ |
| সুনামগঞ্জ | -৮ | -৬ | -১ |
| মৌলভীবাজার | -৭ | -৬ | -৪ |
| হবিগঞ্জ | -৬ | -৪ | -২ |

### রাজশাহী বিভাগ

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|
| রাজশাহী | +৬ | +৬ | +৯ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | +৬ | +৮ | +১১ |
| নাটোর | +৪ | +৫ | +৮ |
| পাবনা | +৪ | +৫ | +৬ |
| সিরাজগঞ্জ | +১ | +২ | +৪ |
| বগুড়া | +১ | +৩ | +৭ |
| নওগাঁ | +৩ | +৪ | +৯ |
| জয়পুরহাট | +২ | +৩ | +৯ |

### রংপুর বিভাগ

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|
| রংপুর | -২ | +১ | +৯ |
| দিনাজপুর | +১ | +৩ | +১১ |
| গাইবান্ধা | -১ | +১ | +৭ |
| কুড়িগ্রাম | -৩ | -১ | +৮ |
| লালমনিরহাট | -৩ | ০ | +৯ |
| নীলফামারী | -১ | +২ | +১১ |
| পঞ্চগড় | -১ | +২ | +১৩ |
| ঠাকুরগাঁও | +১ | +৪ | +১৩ |

### খুলনা বিভাগ

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|
| খুলনা | +৭ | +৬ | +২ |
| বাগেরহাট | +৭ | +৬ | +১ |
| সাতক্ষীরা | +৯ | +৮ | +৪ |
| যশোর | +৭ | +৭ | +৪ |
| চুয়াডাঙ্গা | +৭ | +৭ | +৬ |
| ঝিনাইদহ | +৬ | +৬ | +৫ |
| কুষ্টিয়া | +৫ | +৬ | +৬ |
| মেহেরপুর | +৮ | +৮ | +৮ |
| মাগুরা | +৫ | +৫ | +৪ |
| নড়াইল | +৬ | +৬ | +৩ |

### বরিশাল বিভাগ

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|
| বরিশাল | +৪ | +৩ | -২ |
| পটুয়াখালী | +৫ | +৪ | -১ |
| পিরোজপুর | +৬ | +৫ | ০ |
| ঝালকাঠি | +৫ | +৪ | -২ |
| ভোলা | +৩ | +২ | -৩ |
| বরগুনা | +৭ | +৫ | -২ |

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৬ষ্ঠ বর্ষ
৯ম সংখ্যা

জুলাই ২০২২
আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৯
যুলহিজ্জাহ-মুহাররম
১৪৪৩-৪৪

# মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

**আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ**

সার্বিক সম্পাদনায়

**আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ**

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

- প্রধান সম্পাদক,
  আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী;
  তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
- সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮
- ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪১
- ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২ (সকাল ৮:০০মি. থেকে সকাল ১০:০০মি.)
- ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com
- ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com
- ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016
- ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ :
  ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮ , ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী :
  ০১৪০৭-০২১৮২২
- জামি'আহর উভয় শাখার জন্য :
  ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ , ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬
- জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :
  বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
  বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

**২৫/- (পঁচিশ টাকা) মাত্র**

| বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা | ষাণ্মাসিক | বাৎসরিক |
|---|---|---|
| সাধারণ ডাক | ২০০/- | ৪০০/- |
| কুরিয়ার সার্ভিস | ৩০০/- | ৬০০/- |

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

## সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ প্রবন্ধ

» আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে? (পর্ব-২) ০৩
*-মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী*
*অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

» মক্কার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ফযীলত ০৬
*-আব্দুল মালেক আহমাদ মাদানী*

» অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ-৮ম পর্ব (মিন্নাতুল বারী-১৫তম পর্ব) ০৯
*-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

» দাজ্জাল সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা (পর্ব-২) ১২
*-আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী*

» যিলহজ্জ মাসের আমল ১৫
*-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন*

» ঈদুল আযহার তাৎপর্য ১৭
*-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ*

» অমনোযোগী পুত্রের প্রতি পিতার হৃদয় নিংড়ানো উপদেশ (শেষ পর্ব) ১৯
*-মূল : আবুল ফারজ ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ*
*অনুবাদ : আব্দুল কাদের বিন রইসুদ্দীন*

» কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মৃত মুসলিমদের জন্য নিবেদিত আমলসমূহের প্রতিদান (পর্ব-৫) ২১
*-মূল : ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী রাহিমাহুল্লাহ*
*অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন*

» ঈমান ভঙ্গের কারণ (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ২৩
*-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী*

» কুরবানীর ইতিহাস ২৫
*-অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন*

◈ হারামাইনের মিম্বার থেকে

» মেহমান ও মেজবানের শিষ্টাচারসমূহ ২৭
*-অনুবাদ : মাহবূবুর রহমান মাদানী*

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ

» রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ : একটি পর্যালোচনা (শেষ পর্ব) ৩০
*-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

» ১১৬ জন আলেমের বিরুদ্ধে শ্বেতপত্র ও আমাদের শ্রীলংকা ভীতি ৩২
*-জুয়েল রানা*

◈ দিশারী

» ত্যাগের দীক্ষা দিতে কুরবানী এলো আজ ঘরে ঘরে... ৩৪
*-জাবির হোসেন*

◈ জামি'আহ পাতা

» প্রিয় ভাই! প্রিয় শিক্ষক! ৩৯
-মাযহারুল ইসলাম আবির

◈ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

» কুরবানী ৪০
*-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী*

◈ কবিতা ৪২

◈ সংবাদ ৪৩

◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৫

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

## উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বন্ধ করুন

আলেম-উলামার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন চিত্র ফুটে উঠছে প্রতিনিয়ত। মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো, হয়রানি, গ্রেফতারসহ আইনী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ সেসব ষড়যন্ত্রেরই কয়েকটি দিক। সম্প্রতি ভূইফোঁড় তথাকথিত 'গণকমিশন' কর্তৃক দেশের শতাধিক আলেম ও বক্তাকে হেয়প্রতিপন্ন করে দুদকে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের সেই নির্লজ্জ ধারাবাহিকতারই অংশবিশেষ।

অথচ আলেম-উলামা এদেশের বৈধ নাগরিক, তারা এখানকার গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। আলেম-উলামা জাতির রাহবার। প্রকৃত মানুষ তৈরির কারিগর। তারা নিজেরা যেমন যে কোনো অন্যায়ের ব্যাপারে আপসহীন; ছোট-বড় দুর্নীতি থেকে বহু দূরে; তেমনি দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে সবচেয়ে কম সুবিধা ভোগ করা সত্ত্বেও সবচেয়ে বেশি সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তারাই। জন্মভূমির প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা, এর স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা, দেশ-জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য সর্বকালে তাদের রয়েছে অগ্রণী ভূমিকা। ফেতনা-ফাসাদ, ঝগড়া-বিবাদ, অন্যায়-অনাচার, দুর্নীতি-কদাচার, যেনা-ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, মারামারি, হানাহানি, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি থেকে জনগণকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আলেম-উলামার অবদান সবচেয়ে বেশি। এমনকি দেশের প্রশাসন যে কাজগুলো হয়তো করতে পারেন না, সেগুলোতে উলামায়ে কেরামের রয়েছে সক্রিয় অংশগ্রহণ। যোগ্য নাগরিক তৈরি, মানবসম্পদ তৈরি, শান্তিময় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য উলামায়ে কেরাম কাজ করে যাচ্ছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানেও তাদের অবদান কম নয়। এককথায় এদেশের আপামর জনগণকে মানুষের মতো মানুষ তৈরিতে ও একটি শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধ দেশ গঠনে আলেম-উলামা পাঠদান, উপদেশদান, জুম'আ ও ঈদের খুৎবা প্রদান, ধর্মীয় জালসা, লেখনি ইত্যাদি নানা উপায়ে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন। একজন মানুষের ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তির জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন আলেম-উলামাই।

সেজন্যই তো ইসলাম আলেম-উলামার সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছে *(আল-মুজাদালাহ, ৫৮/১১)*। হাদীছে আলেম-উলামাকে পূর্ণিমার চাঁদের সাথে তুলনা করা হয়েছে *(আহমাদ, হা/২১৭১৫)*। কারণ তারাই মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশারী। আবূ মুসলিম খাওলানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ভূপৃষ্ঠে উলামায়ে কেরাম হচ্ছেন আসমানে তারকারাজির মতো। যখন সেগুলো মানুষের জন্য উদিত হয়, তখন তারা সেগুলো দ্বারা পথ খুঁজে পায়। আর সেগুলো অস্তমিত হলে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে' *(নববী, আল-মাজমূ', ১/১৯)*। তাদের মর্যাদা, গুরুত্ব ও সার্বজনীন কল্যাণকামিতার কারণেই ফেরেশতা থেকে শুরু করে পানির নিচের মাছ ও গর্তের পিঁপড়া পর্যন্ত সবাই তাদের জন্য কল্যাণের দু'আ করে *(তিরমিযী, হা/২৬৮৫)*।

এই যাদের মর্যাদা, এই যাদের অবদান, তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা, তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা কারো জন্যই সমীচীন নয়; বরং তা রীতিমতো অন্যায়। হাদীছে কুদুসীতে মহান আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার কোনো অলীর সঙ্গে দুশমনি করবে, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করব' *(বুখারী, হা/৬৫০২)*। হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী রহিমাহুল্লাহ এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, 'এখানে আল্লাহর অলী দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তি, যিনি সর্বদা তার আনুগত্য করেন' *(ফাতহুল বারী, ১১/৩৪২)*। ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'দুনিয়া ও আখিরাতে ফক্বীহ ও আলেমগণ যদি আল্লাহর অলী না হবেন, তাহলে আল্লাহর কোনো অলী নেই' *(আল-ফাক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ১/১৫০)*। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো ফক্বীহকে কষ্ট দিল, সে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কষ্ট দিল। আর যে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কষ্ট দিল, সে স্বয়ং মহান আল্লাহকে কষ্ট দিল' *(আল-মাজমূ', ১/২৪)*।

অতএব, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্র সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক আহ্বান, আলেম-উলামার প্রতি যথাযথ সম্মান, মর্যাদা, ভক্তি, আদব ও ভালোবাসা বজায় রাখুন। তাদের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করুন। তাদের ভুলত্রুটি ন্যায়সঙ্গত উপায়ে হিকমতের সাথে সংশোধনের চেষ্টা করুন। সরকারের প্রতি আমাদের বিশেষ আহ্বান, উস্কানি ও ষড়যন্ত্রমূলক যে কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ন্যায়সঙ্গত অবস্থান গ্রহণ করুন। 'গণকমিশন'-এর ব্যাপারে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

আমরা মনে করি, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের ভূমিকা ও উলামায়ে কেরামের প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় করা গেলে খুব সহজেই একটি সত্যিকার আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

# আল্লাহর দিকে দাওয়াত :
# দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে?

*মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী**

*অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী***

(পর্ব-২)

**[শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহীম শাক্করার অভিমতের শেষাংশ]**

বিভিন্ন দাওয়াতী প্লাটফর্মের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এসব অলা বা আন্তরিকতা ও সুসম্পর্ক যে কত মন্দ ও নেতিবাচক পরিণামের জন্ম দিয়েছে, তা গণনা করে আমি এখানে কলেবর লম্বা করতে চাইছি না। আমি এখানে শুধু ৪টি কুফলের কথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করছি—

(১) দলীয় কোন্দল দেখতে দেখতে সাধারণ জনগণের হৃদয়মাঝে সন্দেহ-সংশয়ের চোরাগলি তৈরি হয়। এই সন্দেহ-সংশয়ে ময়দান ভারী হয়ে যায়, লেখালেখির ছড়াছড়ি হয় আর চারিদিক হট্টগোল-গণ্ডগোল ও ঝগড়া-বিবাদে ভরে যায়। নির্দোষ হৃদয়গুলোকে হিংসা-বিদ্বেষ আন্দোলিত করে তোলে। নিরপরাধ মানুষগুলোকে হিংসা ও অহংকারের বিষাক্ত ছোবলের মুখে ঠেলে দেয়। এই সন্দেহ-সংশয় আমিত্ব ও স্বার্থপরতার ধ্বংসাত্মক অভিপ্রায়ের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়।

দলীয় কোন্দল গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে, এর আগুনে মান-সম্মান ভস্মীভূত হয় এবং এর বিদ্বেষের তীক্ষ্ণ ধার বহু নিষ্কলুষ মানুষকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে।

(২) দলীয় অন্ধভক্তির কারণে অন্যায়ভাবে দলের পক্ষ অবলম্বন করা হয় এবং দলের সাহায্যে কাজ করা হয়। অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট দাওয়াতী বলয়ের সাথেই কেবল সম্পর্ক রক্ষা করা হয়। অথবা শুধু ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা হয়, যে সেই দলের সাথে যুক্ত আছে। কারণ ভুলের উপর থাকলেও সে তো তার দলেরই লোক।

সব সমস্যা তো সেই ব্যক্তির জন্য, যে তার দলের নয়। কারণ কঠিন সময়েও সে তার কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাবে না।

দাওয়াতী ময়দানের সব দল ও জামাআতের মধ্যেই এটা আমরা ঘটতে দেখেছি। কারণ প্রত্যেকটা দলের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন কর্মপদ্ধতি, অঙ্গীকারনামা ও বায়আত, যা প্রত্যেক সদস্যকে দলের স্বার্থে কাজ করতে বাধ্য করে। এরপর সেই জামাআতের বা দলের গণ্ডির বাইরের কারো উপর অজ্ঞতার ট্যাগ লাগাতে তার বুক মোটেও কাপে না। এমনকি সে যালেম হোক বা মাযলূম হোক, তাকে সাহায্যের কোনো পথও সে খুঁজে পায় না; অথচ এ ব্যাপারে তার নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নির্দেশনা মেনে নেওয়ার কথা ছিলো।

(৩) এর মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের জন্য আক্বীদা ও আমল উভয় ক্ষেত্রে ইসলামের সমালোচনা করার পথ সহজ করে দেওয়া হয়। কারণ একই আক্বীদা বিভক্তি সৃষ্টি করতে পারে না; বরং সঙ্ঘবদ্ধ করে। আর সেই আক্বীদা থেকে নিঃসৃত বিধিবিধানের উপর আমলের ক্ষেত্রেও কোনো দ্বিধা-বিভক্তি হওয়ার কথা নয়। তাহলে একই আক্বীদা ও মানহাজের অনুসারীরা কীভাবে পরস্পর বিভক্ত, শত্রু ও বিদ্বেষী হতে পারে! অথচ আমরা অন্যান্য আক্বীদা ও ধর্মের মানুষগুলোকে একতাবদ্ধ ও সঙ্গতিপূর্ণ পাই!

তাহলে এসব ইসলামী দল ও জামা'আতকে উপস্থাপন করে ইসলামবিদ্বেষীরা কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এ দলীল গ্রহণ করতে পারে না যে, ইসলামের আক্বীদা ও বিধিবিধান মানবতার ঐক্যের জন্য যথেষ্ট নয়?! তাছাড়া এই ব্যাপারটা কিন্তু অধিকাংশ

---

* বইটির লেখক আলী ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আব্দুল হামীদ আল-হালাবী আল-আছারী (জন্ম : ১৩৮০ হিজরী) একজন ফিলিস্তীনী সালাফী আলেম। তিনি আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানীর অত্যন্ত ঘনিষ্ট ও প্রিয় ছাত্র ছিলেন। শায়খ আলবানী, শায়খ ইবনে বায, শায়খ বাকর আবূ যায়েদ, শায়খ মুক্ববিল ইবনে হাদী, শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত উলামায়ে কেরাম শায়খ আলী আল-হালাবীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি একাধারে প্রসিদ্ধ আলোচক এবং বহু গ্রন্থপ্রণেতা।

** বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

মুসলিমকে প্রকৃত ইসলাম আঁকড়ে ধরা থেকেও দূরে রাখে। যে প্রকৃত ইসলাম আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে স্বয়ং নবী ﷺ আমাদেরকে বলে গেছেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ 'আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। যে দু'টি আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা কস্মিনকালেও পথভ্রষ্ট হবে না: আল্লাহর কিতাব ও তার নবীর সুন্নাত'।[১] মানুষের প্রকৃত ইসলাম থেকে দূরে থাকার আরেকটি কারণ হচ্ছে— প্রত্যেকটি জামাআত বা দল দাবি করছে যে, সে একাই কেবল হকের উপর রয়েছে। কেননা সে-ই কিতাব ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরে আছে। আসলে তাদের সকলের বেলায় কবির এ কথাটাই খাটে— :

وَكُلُّ يَدَّعِي وَصْلاً بِلَيْلَى وَلَيْلَى لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَا

[গদ্যানুবাদ] 'প্রত্যেকেই লায়লার সাথে সম্পর্কের দাবি করছে; কিন্তু লায়লা তাদের কারো সম্পর্কেরই স্বীকৃতি দিচ্ছে না'।

একটি মানহাজের উপর, একটি কিবলার উপর, একটি হেদায়াতের উপর এবং একটি মতের উপর এই উম্মত একটিমাত্র উম্মত হিসেবে থাকবে— এটাই মহান আল্লাহর ঐকান্তিক চাওয়া। যাতে করে এই উম্মত আল্লাহনির্ধারিত হক্কের পথে সকল উম্মতের জন্য দুনিয়াতে মডেল হতে পারে এবং কিয়ামতের দিন হতে পারে সকল উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষী। কারণ এই উম্মতকে এমন সব বৈশিষ্ট্য আল্লাহ দান করেছেন, যা আর কাউকে তিনি দান করেননি।

সেকারণে যা কিছু এই উম্মতকে বিভক্তিতে ঠেলে দিচ্ছে, তাদের পরস্পরের দূরত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং মহান আল্লাহর এ অমীয় বাণীর মর্মার্থ থেকে বিরত রাখছে— ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ 'মুমিনরা তো কেবল পরস্পর ভাই ভাই',[২] তার সবটাই কিন্তু দ্বীনী কাজের নামে, দাওয়াতী কর্মসূচির নামে, ইসলামী চিন্তা-চেতনার নামে, বরং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের নামে আমদানি হচ্ছে। মানুষের প্রাত্যহিক ও স্বাভাবিক ব্যাপারেই যে শুধু বিভক্তির উপকরণগুলো আমদানি করা হচ্ছে তা কিন্তু নয়; বরং পরকাল সংশ্লিষ্ট বিষয়েও সেগুলো আমদানি হচ্ছে।... আফগানিস্তান ও ফিলিস্তীনের ব্যাপারগুলো কিন্তু আমাদের থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

দাওয়াতী ময়দানের কর্মীরা কখন অনুধাবন করতে শিখবেন যে, তারা গোনাহগার হচ্ছেন এবং দলীয় চাদর থেকে নিজেদেরকে মুক্ত না করা পর্যন্ত সেই গোনাহ থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই?!

(৪) এর মাধ্যমে কিছু মানুষ সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছে। দাওয়াতী ময়দানের দাঈ ও কর্মীদের যবান তাদেরকে এমনভাবে আক্রমণ করছে যে, মাটিতে মাথা না রাখা পর্যন্ত সেই আক্রমণ তাদের প্রতি রহমও করছে না, তাদেরকে নিষ্কৃতিও দিচ্ছে না।

তারাই সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছে, যারা ঐসব জামাআতসমূহের কোনো জামাআতে কাজ করা থেকে বিরত থাকছে। আর তাদের বিরত থাকার কারণ হচ্ছে, তারা সেই জামাআতের ভুলগুলো সংশোধন করতে পারছে না। ফলে তারা এই জামাআতের অধীনে থাকতেও পারছে না। বিশেষ করে ঐসব যবানের খুব চমৎকার ও লোভনীয় শিকারে পরিণত হচ্ছে তারা, যারা দাওয়াতী নতুন নতুন পরিভাষা অনুযায়ী নেতা বা প্রধান হিসেবে বিবেচিত।

আমরা অনেক মানুষকে দেখেছি, যাদের চরিত্র বা দ্বীনের ব্যাপারে কোনো ধরনের কালিমা লেপনের সুযোগ নেই, তারাও দলীয় গণ্ডি ছেড়ে দেওয়ার কারণে বলির পাঠা হচ্ছে। অথচ এই লোকগুলোই দলে থাকাকালীন সাদা মেঘের চেয়েও পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ছিলে। আর দল ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথেই তারা হয়ে গেছে নিকৃষ্ট।

এটাই কিন্তু আমাদের সামনে তৃষ্ণার্ত দলগুলোর গোঁমর ফাঁস করে দেয়; হিংসা-বিদ্বেষ ছাড়া অন্য কিছু সেগুলোর তৃষ্ণা মেটাতে পারে না। অথচ এগুলো এমন চরিত্র, যা ব্যক্তিকে ধ্বংস ও মন্দ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

উল্লিখিত ৪টি কুফল হচ্ছে মূল, যেগুলো থেকে আরো বহু মন্দ শাখা-প্রশাখা বের হতে পারে। মুসলিম যুবকরা বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা সৎ, যারা নিজেদেরকে ইসলামের সৈনিক মনে করে, তারা যদি এই কুফলগুলো বুঝত, তাহলে শুরুতেই থেমে যেত। ৭৩ দলের একজন হওয়া থেকে

১. মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/১৮৭৪।
২. আল-হুজুরাত, ৪৯/১০।

নিজেদেরকে বিরত রাখত, যে ব্যাপারে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। কারণ মুসলিম উম্মাহ একটিই উম্মত এবং তাদের চলার পথও একটিই।

এখন কোনো দলের অধীনে সঙ্গবদ্ধ হওয়া যেন ইসলামের নিদর্শন ও নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার মাধ্যমে মুসলিমরা তাদের রবের সান্নিধ্য পেতে পারে। প্রতিদিনই দল আকারে বা সংগঠন আকারে বা ফাউন্ডেশন আকারে বা ক্লাব আকারে আমাদের নিকট নতুন নতুন দল বের হচ্ছে। প্রত্যেকটি দলই শুরুতে হাতে রেশমি মোজা পরে ও মুখে মিষ্টি বুলি নিয়ে কার্যক্রম শুরু করছে; কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই অন্যদের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ছাড়া আর কিছুই দেখছে না। মনে করছে, তাদের হাতে ছাড়া আল্লাহ কল্যাণ দিবেন না। তাদের দায়িত্বশীলরাই সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার উপযুক্ত। অবশেষে সকল দলের সাথে এ বাণীই মিলে যাচ্ছে— ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ 'প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে, তা নিয়েই আনন্দিত'।[৩] (দুঃখের বিষয় হচ্ছে) এগুলো কমার পরিবর্তে বাড়ছে এবং মানুষকে দিকভ্রান্ত করে ছাড়ছে।

কোনো বিবেকবান মুসলিম কখনই মনে করতে পারে না যে, জামাআত, সংগঠন ও ফাউন্ডেশন বাড়লে মুসলিমদের ঐক্য হয়। কত যে ঐক্য হয় তার পক্ষে দলীল তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি।

যে ব্যক্তি ইসলামের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করবে, সে নিশ্চিতভাবে জানবে যে, প্রসিদ্ধ ফিরক্বাগুলো একটাও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং সবগুলোই পথভ্রষ্ট ফিরক্বা। আর রাষ্ট্রনেতা ও খলীফার অনুপস্থিতে কোনো সুস্থ ফেত্বরাত এসব ফিরক্বার দিকে ধাবিত হতে পারে না। যে ব্যক্তি শাসকের অনুপস্থিতিকে দল গঠনের কারণ মনে করে, তার জন্য এখানে আসলে কোনো কৈফিয়তই নেই। দল গঠন তো দূরের কথা, একথা ভাবারই সুযোগ নেই।

খুব স্বাভাবিক কথা হচ্ছে, এসব দল তাদের কর্মতৎপরতায় হয় দেশের আইন-কানুন মেনে চলে, না হয় চলে না। অবস্থা যদি দ্বিতীয়টা হয়, তাহলে সে লম্বা সময় তার গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারবে না। বরং তার ভেতরের বিষয় রাষ্ট্রের কাছে প্রকাশ করে দেবে। ফলে তার মাঝে ও রাষ্ট্রের মাঝে দ্বন্দ্ব তৈরি হবে। আর যদি সে তার গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারে, তাহলে সে বাতেনীদের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। আর তা তো বিরাট মুছীবত এবং শিরকের গোনাহে ভারী।

আল্লাহর কসম! দাওয়াতীকাজে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, দলাদলি থেকে মুক্ত হয়ে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে দাওয়াতীকাজের ফল অনেক ভালো এবং এপথের অনুসারীরাই প্রকৃত নির্মাতা ও সংগঠক। আল্লাহর ইচ্ছায় এপথই তার অনুসারীকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। অতি উৎসাহীরা তাদের দলীয় কার্যক্রম বৈধ প্রমাণের ইচ্ছায় কুরআন-হাদীছের 'আম কিছু বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে থাকে, যা কখনই হক্বের পথে পরিচালিত করতে পারে না। তাছাড়া এতে ব্যাপক কৃত্রিমতা তো রয়েছেই, যা আমরা কেবল দর্শনশাস্ত্রেই দেখে থাকি।

আসলে আমি আমার কথা এমন লম্বা করে ফেলেছি যে, এই মূল্যবান পুস্তিকাটির চমৎকার দিকগুলো এখনও বলতেই পারিনি। আমার কথা যতটুকু বলেছি, তা আপাতত যথেষ্ট মনে করছি। বইটির ১৪টি অনুচ্ছেদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ার পর সম্মানিত পাঠকের কাছেই ভালো বা মন্দ মন্তব্য করার দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চাই। বইটির ব্যাপারে আমার অনুভূতি হচ্ছে, বইটি পড়ে আমার খুব ভালো লেগেছে। আমার মনে হয়, যে কেউ বইটি ইনছাফ ও খালি ব্রেইনে বইটি পড়লে এর ব্যাপারে আমার মতো মন্তব্য না করে তার উপায় থাকবে না।

মহান আল্লাহ আমাদের স্নেহধন্য আলীকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তিনি চমৎকার কাজ করেছেন। আল্লাহ তাকে ও তার কলমে বরকত দান করুন। আল্লাহ তাকে তার পক্ষ থেকে বিশেষ সাহায্য দান করুন। তাকে আরো বেশি উপকারী ইলমের খিদমত করার তাওফীক্ব দান করুন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, আহ্বানে সাড়া দানকারী।

মহান আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবার-পরিজন, ছাহাবীগণ, তাবেঈগণ এবং সৎভাবে তাদের অনুসারীগণের উপর রহমত, শান্তি ও বরকত বর্ষণ করুন।

*জুমআ ১১ রামাযান ১৪১০ হিজরী*

*(চলবে)*

৩. আল-মুমিনূন, ২৩/৫৩।

# মক্কার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ফযীলত

-আব্দুল মালেক আহমাদ মাদানী*

মুসলিমদের সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র স্থান মক্কা। মাসজিদুল হারাম এই মক্কা নগরীতেই অবস্থিত। আখেরী যামানার নবী মুহাম্মাদ ﷺ এখানেই জন্মগ্রহণ করেন এবং হেরা পর্বতে অহীপ্রাপ্ত হন। নবুঅতের ১৩টি বছর তিনি এখানেই অতিবাহিত করেন। এত সব মর্যাদার কারণে সকল মুসলিমের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হলো তাকে পবিত্র মক্কা নগরী ও তার ইতিহাস সম্পর্কে জানা, এই নিবন্ধে তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হলো।

নবী ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) স্ত্রী সারাকে সঙ্গে নিয়ে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজের জন্মভূমি ইরাকের বাবেল শহর ত্যাগ করেন এবং হিজরত করে শামে গমন করেন। অতঃপর শাম থেকে মিশরে পৌঁছলে সেখানকার অত্যাচারী চরিত্রহীন লম্পট শাসক তাঁর সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অনৈতিক কর্মের বাসনা দেখাতে গিয়ে আল্লাহর গযবে নিপতিত হন। এতে শাসক ভীত হয়ে নিজের দাসী হাজেরাকে সারার খেদমতে দান করে দেন।

এই হাজেরাই হলো ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর মা।[১] সন্তান ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর জন্ম হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে হাজেরার প্রতি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর ভালোবাসা একটু বেশি হয়ে যায়, কিন্তু সারার পক্ষে তা মেনে নেওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।[২] আল্লাহর নির্দেশে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) স্ত্রী হাজেরা ও নবজাতক শিশু ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)কে সঙ্গে নিয়ে জনমানবহীন ধু-ধু মরুভূমি মক্কায় গমন করেন এবং কা'বার পার্শ্বে স্ত্রী হাজেরা ও নবজাতক শিশু ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)কে রেখে যান।

মূলত ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) মক্কায় মানবজাতির বসবাসের সূচনা করেন। যদিও কেউ কেউ বলেন, মক্কার আশেপাশে আমালিকা সম্প্রদায় বসবাস করত।[৩] হাজেরা তার সন্তান ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে নিয়ে কা'বার পাশে বসবাস শুরু করেন। একপর্যায়ে শিশু ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর পায়ের আঘাত থেকে পানির আবির্ভাব ঘটে, যা যমযম কূপ হিসেবে খ্যাত। রাসূল ﷺ বলেন, 'ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর মা হাজেরার উপর আল্লাহ রহম করুন। কেননা তিনি যদি যমযমকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিতেন, তাহলে তা একটি প্রবাহিত ঝরনায় পরিণত হতো'।[৪]

**যমযম পানি পানের ফযীলত :**

উনায়স (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি এখানে (কা'বায়) ৩০ দিন যাবৎ আছি। রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমাকে কে খাদ্য দিত? আমি বললাম, যমযম কূপের পানি ব্যতীত আমার জন্য কোনো খাদ্য ছিল না। এ পানি পান করেই আমি স্থূলদেহী হয়ে গেছি। এমনকি আমার পেটের চামড়ায় ভাজ পড়েছে এবং আমি কখনো ক্ষুধার কোনো দুর্বলতা বুঝতে পারিনি। তিনি বললেন, 'এ পানি অতিশয় বরকতময় ও প্রাচুর্যময় এবং তা অন্যান্য খাবারের মতো পেট পূর্ণ করে দেয়'।[৫] আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের সঙ্গে পাত্রে ও মশকে করে যমযমের পানি বহন করতেন'।[৬]

একদা জুরহুম গোত্রের লোকেরা কা'বার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় যমযমের পানি দেখে হাজেরা ও ইসমাইল (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট বলল, আমাদেরকে কি আপনাদের নিকট অবস্থান করার অনুমতি দিবেন? তিনি (হাজেরা) বললেন, হ্যাঁ। তবে পানির উপর তোমাদের কোনো অধিকার থাকবে না। তারা বলল, ঠিক আছে।[৭]

অতঃপর জুরহুম গোত্রের লোকদের মাধ্যমে মক্কায় জনবসতি গড়ে উঠল। ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) যৌবনকালে পৌঁছলে জুরহুম গোত্রের মেয়েকে বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রী তালাক হলে দ্বিতীয় বিবাহ করেন এবং ১২ জন সন্তান জন্মগ্রহণ করে। বহুদিন পর ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) মক্কায় আসেন এবং সন্তান ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে নিয়ে কা'বা নির্মাণ করেন।[৮] কা'বা নির্মাণের সময় জান্নাতী পাথর 'হাজরে আসওয়াদ' কা'বাঘরের দরজার পাশের রুকনে স্থাপন করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, এ যাবৎ কা'বা ১১ বার পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।[৯]

জুরহুম গোত্র মক্কার আমানতদারিতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। ফলে মক্কা নগরীতে যেনা-ব্যভিচার, চুরি-ডাকাতিসহ বিভিন্ন রকমের ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়।

---

* বি.এ. (অনার্স), এম.এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; শিক্ষক, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৬৮; ফাতহুল বারী, ১৩/১৩৪-১৩৫।

২. আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-আযরাকী, আখবারে মক্কা, ১/৫৪; ফাতহুল বারী, ১৩/১৪১; ড. মাহদী রিযকুল্লাহ, আস-সিরাতুন নাবাবী, ১/৪৩-৪৫।

৩. আযরাকী, আখবারে মক্কা, ১/৫৪।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৬২।

৫. ছহীহ মুসলিম, হা/২৪৭৩।

৬. তিরমিযী, হা/৯৬৩।

৭. ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৬২, ৩৩৬৩, ৩৩৬৪, ৩৩৬৫।

৮. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১/২০৮; ড. মাহদী রিযকুল্লাহ, সিরাতুন নববী, ১/৪৭।

৯. ড. মাহদী রিযকুল্লাহ, আস-সিরাতুন নাববী, ১/৪৮-৫২।

এদিকে ইয়ামান থেকে ছা'লাবা ইবনু আমরের নেতৃত্বে খুযা'আ গোত্র মক্কায় হিজরত করে আসে এবং কা'বার পাশে বসবাসের অনুমতি চাইলে জুরহুম গোত্র প্রত্যাখ্যান করে। এতে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে জুরহুম গোত্র পরাজিত হয়ে মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়।[১০]

খুযা'আ গোত্র প্রায় ৩০০ বছর, কেউ কেউ বলেন, ৫০০ বছর মক্কা শাসন করেন। এই খুযা'আ গোত্রের এক নেতা আমর ইবনু লুহাই আল-খুযায়ী শাম থেকে হুবাল নামক মূর্তি নিয়ে কা'বার পাশে রেখে মক্কাবাসীদের পূজা করতে বলেন। তখন থেকেই মক্কাবাসীরা দ্বীনে হানীফ তথা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর তাওহীদী দ্বীন থেকে পৌত্তলিকতায় জড়িয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি আমর ইবনু লুহাই আল-খুযায়ীকে তার বহির্গত নাড়িভুঁড়ি নিয়ে জাহান্নামের আগুনে চলাফেরা করতে দেখেছি। সেই প্রথম ব্যক্তি, যে দ্বীনে ইবরাহীম পরিবর্তন করেছে'।[১১]

একসময় খুযা'আ গোত্র মক্কার আমানতদারিতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। ফলে কা'বার কর্তৃত্ব নিয়ে খুযা'আ গোত্রের সঙ্গে কুরাইশদের যুদ্ধ বাধে। অবশেষে খুযা'আ গোত্র পরাজিত হলে কুরাইশদের নেতা কুছাই ইবনু কেলাব (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঊর্ধ্বতন চতুর্থ দাদা) কা'বার দেখভালের পূর্ণ দায়িত্ব পান।

তার মৃত্যুর পর ছেলে আব্দুদ দার কা'বার নেতৃত্ব পান। আব্দুদ দারের মৃত্যুর পর কা'বার কিছু দায়িত্ব তার ছেলেদের হাতে আসে। আর কিছু দায়িত্ব আবদে মানাফ (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঊর্ধ্বতন তৃতীয় দাদা) এর সন্তানদের হাতে চলে আসে। আবদে মানাফের মৃত্যুর পর তার দুই সন্তান হাশেম (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঊর্ধ্বতন দ্বিতীয় দাদা) ও আবদে শামস কা'বার দায়িত্ব পান।[১২]

হাশেমের মৃত্যুর পর কা'বার দায়িত্ব পান, তার সন্তান আব্দুল মুত্তালিব (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাদা)। আব্দুল মুত্তালিবের সময় অর্থাৎ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মের প্রায় ৫০ দিন পূর্বে ইয়ামানের বাদশাহ আবরাহা কা'বা ধ্বংসের জন্য বিশাল হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কায় আসে এবং আল্লাহ তাআলা তাদের ধ্বংস করে দেন।[১৩]

অতঃপর তার মৃত্যুর পর কা'বার দায়িত্ব পান তার ছেলে আব্বাস (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা)। অতঃপর ৮ম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় করলে কা'বা ও মক্কা নগরী মুসলিমদের হাতে চলে আসে এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা থেকে সকল মূর্তি অপসারণ করে পবিত্র করেন। সূচনা হয় আল্লাহ তাআলার দ্বীন ইসলামের সোনালী যুগ, আল-হামদুলিল্লাহ।

**রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ :** ৮ থেকে ১১ হিজরী, ৩ বছর।

**খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ :** ১১ থেকে ৪০ হিজরী, মোট ৩০ বছর, মক্কা নগরী মুসলিমদের অন্যতম প্রদেশ ছিল।

**উমাইয়া যুগ :** ৪১ হিজরী থেকে ১৩২ হিজরী, ৯০ বছর।

**আব্বাসীয় যুগ :** ১৩২ হিজরী থেকে ৬৫৬ হিজরী, ৫২৪ বছর।

**মামলূকী যুগ :** ৬৪৮ হিজরী থেকে ৯২৩ হিজরী, ২৭৫ বছর।

**উছমানী যুগ :** ৯২৩ হিজরী থেকে ১৩৪৪ হিজরী, ৪২১ বছর।

**সঊদী যুগ :** ১৩৪৪ হিজরী থেকে বর্তমান সময় ১৪৪২ হিজরী পর্যন্ত। মোট ১৪৪২ বছর ধরে পবিত্র মক্কা নগরী অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রদেশ এবং মুসলিমদের প্রাণের কেন্দ্রস্থল হিসেবে মাথা উঁচু করে আছে। উল্লেখ্য, আব্বাসী, মামলূকী ও উছমানী শাসনের সময় মক্কায় বিভিন্ন রকমের বিদআত চালু হয়।

**মক্কা ও মাসজিদুল হারামের কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা :**

১. উমাইয়া শাসন ব্যবস্থায় ৬৪ হিজরীতে ইয়াযীদ ইবনু মু'আবিয়া সেনাপতি হুসাইন ইবনু নুমায়েরকে মক্কায় প্রেরণ করেন আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বায়'আত নেওয়ার জন্য। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু তা প্রত্যাখ্যান করলে হুসাইন মক্কা নগরী অবরোধ করেন এবং মাসজিদুল হারামে মানজানিক[১৪] দিয়ে আক্রমণ করেন, এতে কা'বা ও মাসজিদুল হারামের ব্যাপক ক্ষতি হয়।[১৫]

২. আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু কা'বা ভেঙে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর ভিত্তির উপর কা'বা পুনর্নির্মাণ করেন।[১৬]

৩. উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ান ৭৩ হিজরীতে সেনাপতি হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফকে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে পাঠান। হাজ্জাজ মক্কা অবরোধ করেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে হত্যা করেন ও কা'বা ভেঙে দিয়ে কুরাইশরা যেভাবে তৈরি করেছিল, তার উপর কা'বা তৈরি করেন অর্থাৎ বর্তমান কা'বা।[১৭]

৪. শী'আ কাররামিয়া সম্প্রদায় ৩১৭ হিজরীতে মাসজিদুল হারামে আক্রমণ করে শত শত মুছল্লী ও হাজীদের হত্যা করে মৃতদেহগুলোকে যমযম কূপে নিক্ষেপ করে। এমনকি ইমাম ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কাররামিয়াদের আমীর আবু তাহের কা'বার দরজার সম্মুখে বসে নিজেকে এই বলে ঘোষণা করে যে, আমি আল্লাহ! আমি এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছি,

---

১০. আল-আযরাকী, আখবারে মক্কা, ১/৯০-৯৬।

১১. ছহীহ বুখারী, হা/৪৬২৩; ছহীহ মুসলিম, হা/২৮৫৬; আহমাদ, হা/৭৭১৪; ইবনু হিব্বান, হা/৭৪৯০।

১২. আল-আযরাকী, আখবারে মক্কা, ১/১১০-১১৫।

১৩. তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা আল-ফীলের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪. তৎকালীন সময়ে ব্যবহৃত এক ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র।

১৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/২২১-২৩০।

১৬. প্রাগুক্ত।

১৭. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১১/৬৫০-৬৬০।

আর তা ধ্বংস করে দিব (নাঊযুবিল্লাহ)। এরপর তার নির্দেশে হাজরে আসওয়াদ কা'বা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর আল্লাহর মেহেরবানীতে ৩৩৯ হিজরীতে হাজারে আসওয়াদ মক্কাবাসীরা ফিরে পান।[১৮]

৫. কা'বার চারপাশে প্রচলিত চার মাযহাবের নামে ৪৯৭ হিজরীতে চারটি মিহরাব তৈরি হয়, যা ইসলামের ইতিহাসে একটি নিকৃষ্টতম বিদআত, যা মুসলিম উম্মাহকে অনৈক্যের পথে ঠেলে দেয়। এই বিদআত প্রায় ৭০০ বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।[১৯]

৬. অটোমান তথা উছমানী শাসনামলে ৪০০ বছর মক্কা নগরী ছিল তাদের অন্যতম বৃহৎ প্রদেশ। তাদের শাসনামলেও বিভিন্ন ধরনের বিদআত ও কুসংস্কার চালু হয়, বিশেষ করে কবর পাকা ও তার উপর গম্বুজ তৈরিকরণ।

৭. উছমানীদের পতনের পর ১৯২৫ সালে সঊদ বংশের বাদশাহ আব্দুল আযীয বিদআতীদের হাত থেকে মক্কা দখল করেন এবং সকল শিরক-বিদআতের মূলোৎপাটন করেন। বিশেষ করে কা'বার চারপাশে যে চার মাযহাবের নামে চারটি মিহরাব ছিল, তা ভেঙে দিয়ে একটি মিহরাব রেখে তাতে এক ইমামের পিছনে সকল মুসলিমদের ছালাত আদায়ের ফরমান জারি করেন (আল-হামদুলিল্লাহ)। দীর্ঘ দিনের বিদআত অপসারিত হয়ে সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয়।[২০]

বাদশাহ আব্দুল আযীযের মৃত্যুর পরে তাঁর বংশধর পর্যায়ক্রমে মক্কা শাসন করে আসছেন এবং মক্কা নগরী ও মাসজিদুল হারামের এত উন্নতি করেছেন, যা ইতিহাসে বিরল।

৮. বাদশাহ খালেদের শাসনামলে ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মোতাবেক ১৪০০ হিজরীতে জুহাইমান নামক ব্যক্তি নিজেকে ইমাম মাহদী বলে দাবি করে কা'বা আক্রমণ করে শত শত মুছল্লী হত্যা করে। অবশ্য পরবর্তীতে সে ও তার অনুসারীরা গ্রেফতার হয় এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।[২১]

বাদশাহ খালেদের মৃত্যুর পর তার ভাই বাদশাহ ফাহাদ ক্ষমতায় আসেন এবং মাসজিদুল হারামের আয়তন ব্যাপক বৃদ্ধি করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই বাদশাহ আব্দুল্লাহ ক্ষমতায় আসেন এবং তিনি মাসজিদুল হারাম এতটা প্রশস্ত করেন, যা পূর্বের সকল রেকর্ড অতিক্রম করে। একসঙ্গে প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের ছালাতের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের এই খেদমত কবুল করুন।[২২]

**মক্কা ও মাসজিদুল হারামের ফযীলত :**

১. ইসলামের অন্যতম রুকন হজ্জ, যার পূর্ণ বাস্তবায়ন, মক্কা ও মাসজিদুল হারামে অনুষ্ঠিত হয়।[২৩]

২. পৃথিবীতে সর্বপ্রথম স্থাপিত ঘর কা'বা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ 'নিশ্চয়ই প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে, তা মক্কায়। যা বরকতময় ও সৃষ্টিকুলের জন্য হেদায়াত' *(আলে ইমরান, ৩/৯৬)*। মক্কার মাসজিদুল হারামের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত ঘরখানি পবিত্র কা'বা আর কা'বার চারপাশে গড়ে ওঠা আঙিনাই মাসজিদুল হারাম।

৩. পৃথিবীর সর্বপ্রথম মসজিদ মাসজিদুল হারাম, অতঃপর মাসজিদুল আক্বছা।[২৪]

৪. মসজিদে হারামে এক রাক'আত ছালাত অন্য মসজিদের চেয়ে ১ লক্ষ গুণ বেশি ছওয়াব হয়।[২৫]

৫. ছওয়াবের আশায় যে তিনটি মসজিদ সফর করা যাবে, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদে হারাম, এরপর মসজিদে নববী, অতঃপর মসজিদে আক্বছা।[২৬]

৬. মক্কা হলো হারাম এলাকা। রাসূল ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা মক্কাকে হারাম (সম্মানিত) করেছেন। কোনো মানুষ তাকে সম্মানিত করেননি। সুতরাং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোনো মানুষের জন্য মক্কায় রক্তপাত করা বা এর কোনো গাছ কাটা বৈধ নয়। কোনো প্রাণি শিকার করাও হারাম।[২৭] তবে মানুষ যা আবাদ করে বা যেসব প্রাণি লালনপালন করে, তাতে বাধা নেই।

**মক্কা ও মাসজিদুল হারামে করণীয় ও বর্জনীয় :**

১. কা'বার দিকে পেশাব-পায়খানা না করা। কারণ তা হারাম।[২৮]

২. বিনয়-নম্রতার সঙ্গে বসবাস করা এবং কা'বা ও মাসজিদুল হারামকে সম্মান করা। একই সঙ্গে মিনা, মুযদালিফা ও আরাফা ময়দানকেও সম্মান করা, কোনো প্রকার অন্যায় ও পাপাচারে লিপ্ত না হওয়া।

৩. মাসজিদুল হারামে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা, তাসবীহ-তাহলীল, যিকির-আযকার করা এবং কা'বা তাওয়াফ করা। সামর্থ্য থাকলে হজ্জ ও উমরা করা। বেশি বেশি দু'আ করা, যেহেতু তা দু'আ কবুলের স্থান। আল্লাহ তাআলা তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

১৮. প্রাগুক্ত, ১১/১৬০-১৬৫।
১৯. রিহলাতু ইবনে যুবায়ের, পৃ. ৭০; তারীখে ইমারাতুল মাসজিদিল হারাম, পৃ. ২৩৩।
২০. তারীখে ইমারাতুল মাসজিদিল হারাম, পৃ. ২৩৩।
২১. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : তারীখে ইমারাতুল মাসজিদিল হারাম।
২২. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : তারীখে মামলাকাতুল আরাবিয়্যা আস-সঊদিয়্যাহ এবং তারীখে ইমারাতুল মাসজিদিল হারাম।
২৩. বিস্তারিত দেখুন : হজ্জের বিধানে।
২৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৫২০।
২৫. ইবনু মাজাহ, হা/১৪০৬; আহমাদ, হা/১৪৬৯৪।
২৬. ছহীহ বুখারী, হা/১১৮৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৯৭।
২৭. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৩২।
২৮. ছহীহ বুখারী, হা/৩৯৪।

# অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ (৮ম পর্ব)

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(মিন্নাতুল বারী- ১৫তম পর্ব)

***[যে হাদীছের ব্যাখ্যা চলছে :*** *ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমাকে ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়র হাদীছ শুনিয়েছেন; তিনি বলেন, তাকে লায়ছ হাদীছ শুনিয়েছেন; তিনি বলেন, তাকে উকায়ল হাদীছ শুনিয়েছেন; তিনি ইবনু শিহাব থেকে, তিনি উরওয়া ইবনু যুবায়ের থেকে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট অহির আগমন শুরু হয়। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন না কেন সেই স্বপ্ন সকালের মতো তার সামনে সত্যরূপে প্রকাশিত হতো। অতঃপর তার কাছে একাকিত্ব ভালো লাগতে লাগল। তিনি হেরা গুহায় একাকী থাকতেন এবং রাত্রিকালীন ইবাদতে মগ্ন থাকতেন- যতক্ষণ না পরিবারের কাছে ফিরে প্রয়োজনীয় জিনিস নেওয়ার প্রয়োজন না হতো। অতঃপর তিনি খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট ফিরে আসতেন তিনি তার জন্য অনুরূপ পাথেয় প্রস্তুত করে দিতেন। এভাবেই তার নিকট একদিন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অহি চলে আসে এমতাবস্থায় তিনি হেরা গুহায় ছিলেন। ফেরেশতা তার নিকটে এসে তাকে বললেন, পড়ুন! তিনি বললেন, আমি পড়া জানি না। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ফেরেশতা আমাকে ধরলেন এবং চাপ দিলেন। পুনরায় বললেন, পড়ুন! আমি বললাম, আমি পড়া জানি না। ফেরেশতা আমাকে পুনরায় ধরলেন এবং চাপ দিলেন অতঃপর আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, পড়ুন! আমি বললাম, আমি পড়া জানি না। তিনি আমাকে আবারও সজোরে চাপ দিলেন অতঃপর তিনি বললেন, 'পড়ুন! আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে জমাটবাধা রক্ত হতে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন! আর আপনার প্রতিপালক মহাসম্মানিত'।*

*এই আয়াতগুলো নিয়ে আল্লাহর রাসূল ফিরে আসলেন এমতাবস্থায় তার বুক ধড়ফড় করছিল। তিনি খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকটে আসলেন এবং বললেন, আমাকে চাদর দাও! চাদর দিয়ে ঢেকে দাও! অতঃপর খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অতঃপর তার ভয় কেটে গেলে খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে তিনি পুরো ঘটনা জানালেন এবং বললেন, আমি আমার জীবনের ভয় পাচ্ছি। তখন খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আল্লাহর কসম! কখনোই নয়! মহান আল্লাহ আপনাকে কখনোই অপমানিত করবেন না। নিশ্চয় আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, দুর্বলের বোঝা বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের সম্মান করেন, বিপদ-আপদে মানুষকে সাহায্য করেন। অতঃপর খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে সাথে করে নিয়ে তার চাচাতো ভাই ওয়ারাক্বা ইবনু নওফেলের নিকট নিয়ে গেলেন। যিনি জাহেলী যুগে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি হিব্রু ভাষায় বই লিখতেন। তিনি ইঞ্জীল গ্রন্থকে হিব্রু ভাষায় যতদূর আল্লাহ তাওফীক্ব দিয়েছিলেন লিখেছিলেন। তিনি একজন বৃদ্ধ ও অন্ধ মানুষ ছিলেন। খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে বললেন, হে আমার চাচার ছেলে! আপনার ভাইয়ের ছেলে কী বলে শুনুন! তখন ওয়ারাক্বা মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন, আপনি কী দেখেছেন? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা দেখেছিলেন তাকে তা জানালেন। অতঃপর ওয়ারাক্বা বললেন, ইনিই সেই 'নামূস' যাকে মহান আল্লাহ মূসার নিকট পাঠিয়েছিলেন। হায়! আমি যদি সেদিন বেঁচে থাকতাম যেদিন তোমার জাতি তোমাকে বের করে দিবে! তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সত্যিই কি আমার জাতি আমাকে বের করে দিবে? হ্যাঁ, ইতোপূর্বে কোনো ব্যক্তির নিকটে এই লোক প্রেরিত হয়েছেন আর তাকে তার জাতি বের করে দেয়নি এমনটা হয়নি। তবে তোমার সাথে যেদিন এমন ঘটবে সেদিন যদি আমি বেঁচে থাকি আমি তোমাকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করব। এর কিছুদিন পর ওয়ারাক্বা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইন্তেকাল করেন। আর অহি স্থগিত হয়ে যায়।*

*আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ) ও আবূ ছালেহ (রাহিমাহুল্লাহ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হেলাল ইবনু রাদদাদ (রাহিমাহুল্লাহ) যুহরী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইউনুস ও মা'মার (রাহিমাহুমাল্লাহ) فُؤَادُهُ এর স্থলে بَوَادِرُهُ শব্দ উল্লেখ করেছেন।]*

**সর্বপ্রথম কখন অহি পেয়েছেন মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ?**

সকল মুহাদ্দিছ এ বিষয়ে একমত যে, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট সর্বপ্রথম অহি সোমবারের দিন এসেছে এবং ৪০ বছর পূর্ণ করার পর এসেছে। কিন্তু কোন মাসে এসেছে তা

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; এম. এ. (অধ্যয়নরত), উলূমুল হাদীছ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ-এর মতে, রবীউল আওয়াল মাসের ৮ তারিখে সর্বপ্রথম অহি এসেছে। তথা তখন তার বয়স পূর্ণ ৪০ বছর। আর ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক্ব রহিমাহুল্লাহ-এর মতে, পবিত্র রামাযান মাসের ১৭ তারিখে সর্বপ্রথম অহি এসেছে। তথা তখন তার বয়স ৪০ বছর ৬ মাস। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী রহিমাহুল্লাহ এই দুই মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে বলেন, সত্য স্বপ্ন আসা শুরু হয় রবীউল আওয়ালের ৮ তারিখ সোমবার থেকে আর তার ঠিক ৬ মাস পর ১৭ রামাযান সোমবার সরাসরি জিবরীল আমীন আলাইহিস সালাম অহি নিয়ে আসেন। আর মহান আল্লাহই এ বিষয়ে সঠিক অবগত।

**গারে হেরায় কেন?**

কা'বাঘর থেকে মিনার দিকে যেতে ৩ মাইল দূরত্বে হাতের বামে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম জাবালুন নূর। যার উপরে একটি ঘরের মতো গুহা রয়েছে। যার উচ্চতা এতটুকু যে, মানুষ স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াতে পারবে। আর প্রশস্ততা এতটুকু যে, মানুষ স্বাভাবিকভাবে শুয়ে থাকতে পারবে। সামনের ছিদ্র দিয়ে কা'বাঘর দেখা যায়। এটাকেই বলা হয় গারে হেরা বা হেরা গুহা।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা পাহাড় বা জাবালুন নূরকে কেন ধ্যানের জন্য বাছাই করলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মুহাদ্দিছগণ বলেন যে, স্বাভাবিক জীবন থেকে বের হয়ে মহান আল্লাহর যিকিরে মাশগূল হওয়া ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর দ্বীনের একটা অংশ। মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব নিজেও হেরা গুহায় ধ্যান করতেন। তারই ধারাবাহিকতায় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে একাকিত্ব অবলম্বন করেন। এছাড়াও হেরা গুহা থেকে বায়তুল্লাহ কা'বাঘর দেখা যেত। ফলে ইবাদতে মনোযোগ আরও বাড়ত। যদিও বর্তমানে বড় বড় বিল্ডিংয়ের কারণে হেরা গুহা থেকে সরাসরি কা'বাঘর দেখা যায় না। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

**কত দিন ধ্যান করেছেন?**

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত দিন হেরা গুহায় ধ্যান করেছিলেন এ বিষয়ে উক্ত হাদীছে কিছু বলা না হলেও অন্য বর্ণনায় ছহীহ সূত্রে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। যথা— জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ شَهْرًا 'আমি হেরা গুহায় প্রায় এক মাস ইবাদত করেছি'।[১] ইমাম বায়হাক্বীর দালায়িলুন নবুয়্যাতে এই হাদীছের স্বপক্ষে আরও কয়েকটি হাদীছ আছে। যথা—

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي حِرَاءَ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ شَهْرًا.

'তথা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর হেরা গুহায় এক মাস ইবাদত করতেন'।[২] এই হাদীছগুলো প্রমাণ করে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় প্রতিবছরই এক মাস গারে হেরায় ইবাদত করতেন। আর সেই সম্ভাব্য মাস অবশ্যই রামাযান মাস। যেহেতু তিনি গারে হেরায় থাকা অবস্থায় অহি অবতীর্ণ হয়েছে আর আমরা জানি প্রথম অহি রামাযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। সেহেতু এটা প্রমাণিত হয় যে, তিনি নবুয়্যত পাওয়ার আগেই প্রতি বছর রামাযান মাসে হেরা গুহায় ইবাদতে মগ্ন হতেন।

**কীভাবে ইবাদত করতেন?**

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গারে হেরায় কীভাবে ইবাদত করতেন সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো প্রমাণ নেই। হাদীছে বর্ণিত 'তাহান্নুছ' শব্দের জায়গায় ইবনু হিশামের সীরাতে 'তাহান্নুফ' পাওয়া যায়। 'তাহান্নুফ' শব্দ থেকে এতটুকু অনুমান করা যায় যে, তিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর দ্বীনের আলোকে ইবাদত করতেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

**একাকিত্বের উপকারিতা :**

বর্তমানে হাতে হাতে মোবাইল ও ইন্টারনেট সুবিধার কারণে একাকিত্ব কী জিনিস তা মানুষ কল্পনা করাও ভুলে গেছে। সারা দুনিয়ার সকল খবরের সাথে দ্রুত আপডেট থাকার পাল্লায় আর নিজের সকল খবরাখবর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করার আগ্রহে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বুঁদ হয়ে কেটে যায় কত সময় তা ঠাহর করাও মুশকিল হয়ে পড়ে। আপনি টানা এক সপ্তাহ বা কয়েকদিন ইন্টারনেটবিহীন ও মোবাইলবিহীন থাকলেই অনুভব করতে পারবেন একাকিত্বের উপকারিতা। আর সেই একাকিত্ব যদি হয় রিয়াল লাইফের বিভিন্ন সম্পর্ক থেকেও একাকিত্ব তাহলে মানুষ পায় নিজেকে নিয়ে ভাবার সুযোগ। তার সামনে ফুটে উঠে তার ভুলত্রুটি ও অসহায়ত্ব। মাথা নত হয়ে আসে রবের সামনে। স্মরণ করা যায় মহান সৃষ্টিকর্তাকে। এক আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক তৈরি হয় মহান প্রতিপালকের সাথে। যা মানুষকে মানসিক শক্তি ও সঠিক পথের দিশা দেয়।

একাকিত্বই সকল ভালো কাজের প্রথম স্তর। ভালোভাবে পড়তে চান একাকিত্ব দরকার। মনোযোগ দিয়ে কিছু করতে চান একাকিত্ব দরকার। ভালোভাবে ইবাদত করতে চান একাকিত্ব দরকার। একাকিত্ব এমন এক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মানুষ যদি অযোগ্যও হয় কিন্তু সে বন্ধুবান্ধবের আড্ডা থেকে

১. ছহীহ বুখারী, হা/৪৯২৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬১।

২. তাগলীকুত তা'লীক্ব, ৫/৮৯।

দূরে থেকে একাকী নিজের জ্ঞান বিকাশে মনোযোগ দেয় তাহলে একদিন সে তার অযোগ্যতাকে শানিত করে নিজেকে হীরা বানিয়ে ফেলতে পারবে। অন্যদিকে হীরার মতো মানুষ যদি চায়ের স্টলের আড্ডা বা বন্ধুবান্ধবের আড্ডায় নিজেকে জাড়িয়ে ফেলে সে একদিন হীরা থেকে অপদার্থে পরিণত হবে। এই জন্য আমি বলে থাকি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হচ্ছে ডিজিটাল চায়ের স্টলের আড্ডা। যেখানে হারিয়ে যায় লাখো মেধাবীর মেধা। অপচয় হয় কোটি প্রতিভাবানের মূল্যবান সময়। রাসূল ﷺ-কেও মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে নেওয়ার জন্য অহি গ্রহণের মতো পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ তার অন্তরে একাকিত্বের প্রতি ভালোবাসা দান করেন। আমাদেরও উচিত মাঝে মাঝে একাকিত্ব অবলম্বন করা।

**আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার উপায় কী?**

বিপদাপদ মানবজীবনের চিরসঙ্গী। জীবন ফুলশয্যা নয়। বরং লড়াই করে টিকে থাকাই জীবন। জীবনের প্রতিটি পদে রয়েছে নতুন নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঝুঁকি। প্রয়োজন রয়েছে সিদ্ধান্ত পরবর্তী সমস্যা মোকাবেলা করার সাহস। মানুষ যেহেতু দুর্বল সৃষ্টিজীব সেহেতু সবসময় সে নিজের টাকা-পয়সা, ক্ষমতা ও বুদ্ধির জোরে সকল সমস্যার সমাধান করতে পরবে না; বরং প্রয়োজন হয় মহান আল্লাহর সাহায্যের। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রব্বুল ইযযতের দয়া ও সাহায্য ছাড়া দুনিয়ার কোনো মানুষের পক্ষে কোনো কিছুই করা সম্ভব নয়। আপনি যদি সবসময় আপনার উপর মহান আল্লাহর দয়ার দৃষ্টি রাখতে চান, আবৃত থাকতে চান তার করুণার আঁধারে, পাশে পেতে চান তাকে সবসময়, তাহলে আপনার জন্য এই হাদীছে তার সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকর পথ বলে দেওয়া হয়েছে। আর তা হচ্ছে— আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, ঋণগ্রস্তের বোঝা উঠানো, যার কিছুই নেই তাকে সহযোগিতা করা, যে বিপদে পড়েছে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধারে এগিয়ে যাওয়া, মেহমানের মেহমানদারী করা।

**আমাদের দাওয়াতে সফলতা না আসার কারণ এই হাদীছের সবচেয়ে বড় শিক্ষা :**

এই হাদীছের সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে, যেখানে রাসূল ﷺ মহান আল্লাহর ইবাদত ও ধ্যান থেকে ফিরে আসছেন সেখানে তাকে অভয়বাণী দেওয়ার জন্য খাদীজা رضي الله عنها চাইলে একথা বলতে পারতেন যে, মহান আল্লাহ আপনার ক্ষতি করবেন না, কেননা আপনি হেরা গুহায় মহান আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। এই উত্তর দেওয়াই সার্বিক পরিস্থিতির সাথে বেশি মানানসই ছিল। কিন্তু তিনি তা না বলে এমন পাঁচটি গুণের কথা বললেন, যার একটারও সরাসরি মহান আল্লাহর ইবাদতের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি হেরা গুহার ইবাদত, ছিয়াম, জাহেলী যুগের যেনা-ব্যভিচার ও মদ্যপান থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি কোনো গুণের কথাই বললেন না। তিনি যতগুলো গুণের কথা বলেছেন, তার সবগুলোই মানবসেবার সাথে সম্পর্কিত। তার এই মানবসেবার গুণ শুধু তাকে মহান আল্লাহর সাহায্য পেতেই সহযোগিতা করেনি; বরং দাওয়াতী ময়দানে বিপ্লব আনতে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের বর্তমান দায়ী ও আলেমগণের মধ্যে এই পাঁচটি গুণের সবচেয়ে বেশি অভাব পরিলক্ষিত হয়। শুধু তাই নয়; বরং এর বিপরীতটাই পাওয়া যায়। পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ, মানুষকে বিদআতী-মুশরিক, কাফের-ফাসেক্ব ইত্যাদি বলে ছোট করা, সহযোগিতা করা তো দূরে থাক, বরং মানুষের সহযোগিতা পাওয়ার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা। বর্তমান যুগে ভালো আলেম মানে সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে গবেষণায় ব্যস্ত থাকা। অনেকেই মনে করতে পারেন, ভালো আলেম মানে সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে ইবাদতে মগ্ন থাকা। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাজার-ঘাট থেকে শত মাইল দূরে থাকা। অথচ রাসূল ﷺ-এর এই পাঁচটি গুণের প্রতিটিই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক গুণ। এখনকার সমাজের অধঃপতনের সবচেয়ে বড় কারণ বর্তমান যুগের আলেম-ওলামা, ইমাম-মুযাযযিন, ক্বওমী মাদরাসার ছাত্ররা সমাজবিচ্ছিন্ন। আল্লাহর রাসূল ﷺ ছিলেন সমাজের মূল স্রোতের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। ফলে তার প্রতিটি দাওয়াত সমাজে ফেলেছে ব্যাপক ও সীমাহীন প্রভাব। জড় বা গোড়া থেকে তিনি সমাজকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন। সুতরাং বর্তমান যুগে সেই কুরআন ও সেই হাদীছ থাকার পরও দাওয়াতের কাঙ্ক্ষিত সফলতা না আসার প্রধান কারণ দুটি—

(১) সমাজের সাথে সম্পৃক্ত থেকে সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালন না করা। (২) মানবসেবাকে অবহেলা করে আল্লাহর ইবাদতকে সবকিছুর মানদণ্ড মনে করা।

অথচ কিয়ামতের মাঠে সবচেয়ে ভারী হবে ভালো চরিত্রের পাল্লা। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সমাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মানবসেবা করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

*(চলবে)*

# দাজ্জাল সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

-আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী*

(পর্ব-২)

**হাদীছ-৩ :** ‘দাজ্জালের বাহনের দুই কানের দূরত্ব হবে সত্তর হাত’।[১]

**পর্যালোচনা :** এখানে উদ্ধৃতি হিসাবে বায়হাক্বী এবং মিশকাতের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই হাদীছটির সনদ ও মতন নিম্নরূপ—

مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ عَلَى حِمَارٍ أَقْمَرَ مَا بَيْنَ أُذُنَيْهِ سَبْعُونَ بَاعًا-

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, দাজ্জাল সাদা (সবুজ মিশ্রিত) রঙের গাধায় চড়ে বের হবে। তার দুই কানের মাঝে ৭০ হাত দূরত্ব থাকবে।[২]

**তাহক্বীক্ব :** (১) শায়েখ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন।[৩] (২) শায়েখ যুবায়ের আলী যাঈ (হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘বায়হাক্বী একে ‘আল-বা‘ছু ওয়ান নুশূর’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন (যা আমি পাইনি)। ইমাম বুখারী একে আত-তারীখুল কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[৪] আর এর সনদটি যঈফ’।[৫]

**হাদীছ-৪ :** يَخْرُجُ الدَّجَّالُ عَلَى حِمَارٍ، رِجْسٌ عَلَى رِجْسٍ নবী (সা) বলেছেন, দাজ্জাল একটি অপবিত্র গাধার উপর চড়ে বের হবে। নাপাকির উপর নাপাকি তথা ভিষণ নাপাক হবে।[৬]

**তাহক্বীক্ব :** এটি ‘হাসান’ হাদীছ। শায়েখ যুবায়ের আলী যাঈ ‘হাসান’ বলেছেন।[৭] এখন কথা হলো, পন্নী সাহেব দাবি করেছেন যে, দাজ্জাল হলো একটি বর্ণনা। এর দ্বারা ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের সভ্যতাকে বুঝানো হয়েছে। তাহলে এ ‘হাসান’ তথা গ্রহণযোগ্য হাদীছটি এনে তিনি কী বুঝতে চাইলেন? ইয়াহূদী-নাছারা সভ্যতা কি গাধার পিঠে আরোহণ করে বের হবে?

**হাদীছ-৫ :** ‘দাজ্জালের গতি হবে অতি দ্রুত। সে বায়ুতাড়িত মেঘের মত আকাশ দিয়ে উড়ে চোলবে’।[৮]

**পর্যালোচনা :** তিনি নাওয়াস ইবনু সাম‘আন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর বর্ণনায় ছহীহ মুসলিম ও তিরমিযীর বরাত দিয়েছেন। ছহীহ মুসলিমে এমন কোনো হাদীছ নেই। ছহীহ মুসলিমে আছে, كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ ‘বাতাসের প্রবাহ মেঘমালাকে যেভাবে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়, তার গতি হবে তেমন’।[৯] এটুকু বলেই বায়াজীদ সাহেব থেমে গিয়েছেন। অথচ এ হাদীছেই পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِئَةٌ كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ ‘সে হবে মধ্যবয়স্ক যুবক। তার চোখ হবে ফোলা আঙুরের ন্যায়। যেন আমি তাকে আব্দুল উযযা ইবনু কাতানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পাচ্ছি’।[১০] এখানে দাজ্জালকে স্পষ্টভাবে মানুষ বলা হলো। তাকে মানুষের সাথে সাদৃশ্যও দেওয়া হলো। এরপরও দাজ্জালকে মানুষ হিসেবে অস্বীকার করার কোনো কারণ থাকতে পারে কি?

**হাদীছ-৬ :** ‘আল্লাহর রাসূল বলেছেন- দাজ্জালের আদেশে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হবে’।[১১]

**তাহক্বীক্ব :** এখানেও তিনি উপরোল্লিখিত নাওয়াস ইবনু সাম‘আন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর হাদীছটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এতে আছে,إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِئَةٌ ‘সে হবে মধ্যবয়স্ক যুবক। তার চোখ হবে ফোলা আঙুরের ন্যায়’।[১২] এখানে স্পষ্টভবে বলা হয়েছে যে, দাজ্জাল একজন যুবক হবে। অথচ এই কথাটিকে গোপন রেখে স্রেফ পানি বর্ষণের বিষয়টি তুলে ধরে তিনি ধোঁকা দিয়েছেন।

**হাদীছ-৭ :** ‘দাজ্জালের গরু-গাভী, মহিষ, বকরি, ভেড়া, মেষ ইত্যাদি বড় বড় আকারের হবে এবং সেগুলোর স্তনের বোটা বড় বড় হবে...’।[১৩]

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা!, পৃ. ৩১।
২. তাখরীজু আহাদীছিল মারফূআহ, হা/১৭১; মিশকাত, হা/৫৪৯৩; আত-তারীখুল কাবীর, রাবী নং ৬১৩।
৩. যঈফা, হা/১৯৬৮।
৪. আত-তারীখুল কাবীর, ১/১৯৯।
৫. তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/৫৪৯৩, ৩/২৭৮।
৬. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, হা/৩৭৫৩৬, সনদ হাসান।
৭. তাহক্বীক্ব মিশকাত, ৩/২৭৮।
৮. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা!, ‘দাজ্জালের পরিচিতি’ পৃ. ৩২।
৯. ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৩৭; তিরমিযী, হা/২২৪০।
১০. প্রাগুক্ত।
১১. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা!, পৃ. ৩৩।
১২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৩৭।
১৩. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা!, পৃ. ৩৩।



www.al-itisam.com

**পর্যালোচনা :** এটিও উপরিউক্ত হাদীছটির একটি অংশমাত্র। যেহেতু এ হাদীছে দাজ্জালের মধ্যবয়সী যুবক হওয়ার বিষয়টি আছে, সেহেতু এখানেও লেখক ইউরোপ-আমেরিকা ইত্যাদির কথা বলে নিজে গোমরাহ হয়েছেন ও অন্যদেরকে গোমরাহ বানানোর কুপ্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

**হাদীছ-৮ :** ‘দাজ্জাল মাটির নীচের সম্পদকে আদেশ কোরবে ওপরে উঠে আসার জন্য এবং সম্পদগুলি ওপরে উঠে আসবে এবং দাজ্জালের অনুসরণ কোরবে’।[১৪]

**পর্যালোচনা :** এখানেও উপরোল্লিখিত হাদীছটির একটি অংশ বেছে নিয়ে তিনি উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। হাদীছেও দাজ্জালের যুবক হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং ঘুরে ফিরে কুমিরের একই ছানাকে সাত বার দেখানোর ন্যায় একই হাদীছকে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রদর্শন করিয়ে তিনি দাজ্জাল দ্বারা ইউরোপ-আমেরিকা সভ্যতাকে বুঝাতে ব্যর্থ অপচেষ্টা চালিয়েছেন।

**হাদীছ-৯ :** ‘দাজ্জালের কাছে রেযকের বিশাল ভান্ডার থাকবে। সেখান থেকে সে যাকে ইচ্ছা তাকে দেবে। যারা তার বিরোধীতা কোরবে তাদের সে ঐ ভান্ডার থেকে রেযক দেবে না। এইভাবে সে মোসলিমদের অত্যন্ত কষ্ট দিবে। যারা দাজ্জালকে অনুসরণ কোরবে তারা আরামে থাকবে আর যারা তা কোরবে না তারা কষ্টে থাকবে’।[১৫]

**পর্যালোচনা :** এখানে তিনি ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের বরাত প্রদান করেছেন। ছহীহ বুখারীতে এই ভাষার কোনো হাদীছ নেই। ছহীহ মুসলিমেও সরাসরি এমন উক্তি পাইনি, যাকে নবী ﷺ-এর কথা বলে চালানো যায়। তবে এ মর্মের কাছাকাছি হাদীছ রয়েছে, যেগুলোতে দাজ্জালের ‘পুরুষ মানুষ’ হওয়ার বিষয়টির প্রমাণ মেলে। কিন্তু বায়াজীদ সাহেব তা বেমালুম হজম করেছেন।

**হাদীছ-১০ :** ‘দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ হবে’।[১৬]

**পর্যালোচনা :** তিনি এখানে ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন।

(১) ছহীহ বুখারীতে আছে— নবী ﷺ বলেছেন, ‘এরপর আমি তাকাতে থাকলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম, একজন ব্যক্তি-স্থূলকায় লাল বর্ণের, কোঁকড়ানো চুল, এক চোখ অন্ধ, চোখটি যেন ফোলা আঙুরের ন্যায়’।[১৭] এ হাদীছে রাসূল ﷺ ‘رَجُلٌ’ তথা ‘পুরুষ মানুষ’ শব্দটি উল্লেখ করেছেন। অতঃপর স্থূলকায়, লাল বর্ণ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যা প্রমাণ করে যে, দাজ্জাল নিঃসন্দেহে একজন মানুষ। এগুলোকে পরিহার করে নিজের মনগড়া দাবির পক্ষে একরাশ মিথ্যাচারকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লেখক হাদীছগুলোর বিভিন্ন অংশ খণ্ডিত আকারে উপস্থাপন করে বানোয়াট ব্যাখ্যার অবতারণা করেছেন।

(২) (ক) ছহীহ মুসলিমে আছে, ‘আমি একজন পুরুষকে দেখলাম, লালবর্ণ...’।[১৮] (খ) ইমাম মুসলিমে এসেছে, ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ ‘অতঃপর আমি তাকাতে লাগলাম। হঠাৎ একজন লাল বর্ণের, মোটা, ঘন কেশের পুরুষ মানুষকে দেখলাম। যার একটি চোখ অন্ধ’।[১৯] (গ) ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছ বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, الدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى جُفَالُ الشَّعَرِ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ ‘দাজ্জালের বাম চোখ কানা হবে, ঘন চুলের অধিকারী। তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। তার জাহান্নামই হলো (প্রকৃত) জান্নাত। আর তার জান্নাত হলো (প্রকৃত) জাহান্নাম’।[২০]

ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের উপরোল্লিখিত চারটি হাদীছে দাজ্জালকে মানুষ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এরপরও একে অস্বীকার করে ‘ইয়াহূদী-খ্রিষ্টান সভ্যতা’-কে দাজ্জাল বলা হাদীছ বিকৃতির নামান্তর।

**হাদীছ-১১ :** ‘দাজ্জালের সঙ্গে জান্নাত ও জাহান্নামের মতো দুইটি বিষয় থাকবে। সে যেটাকে জান্নাত বোলবে সেটা আসলে হবে জাহান্নাম, আর সে যেটাকে জাহান্নাম বোলবে সেটা আসলে হবে জান্নাত। তোমরা যদি তার (দাজ্জালের) সময় পাও তবে দাজ্জাল যেটাকে জাহান্নাম বোলবে তাতে পতিত হয়ো, সেটা তোমাদের জন্য জান্নাত হবে’।[২১]

**পর্যালোচনা :** এখানেও তিনি ছহীহ বুখারী এবং মুসলিমের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। ছহীহ বুখারীতে এমন কোনো হাদীছ পাইনি। ছহীহ মুসলিমের হাদীছটি হলো—

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى جُفَالُ الشَّعَرِ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ.

১৪. প্রাগুক্ত।
১৫. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা!, পৃ. ৩৪।
১৬. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা!, পৃ. ৩৫।
১৭. ছহীহ বুখারী, হা/৭১২৮।
১৮. ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৯।
১৯. ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১।
২০. ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৩৪।
২১. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা!, পৃ. ৩৭।

হুযায়ফা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘দাজ্জালের বাম চোখ কানা, ঘন চুলবিশিষ্ট হবে। তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। তার জাহান্নাম হলো জান্নাত। আর তার জান্নাত হলো জাহান্নাম’।[২২] এ হাদীছ দ্বারা দাজ্জালের ব্যক্তি হওয়া প্রমাণিত হয়। কারণ এখানে চোখ এবং চুলের দ্বারা (পুরুষ) মানুষকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অথচ লেখক দেহবিশিষ্ট দাজ্জালকে বারংবার অস্বীকার করে গেছেন।

**হাদীছ-১২ :** ‘দাজ্জালের দুই চোখের মাঝখানে (অর্থাৎ কপালে) কাফের লেখা থাকবে। শুধু মো’মেন, বিশ্বাসীরাই তা দেখতে এবং পড়তে পারবে; যারা মো’মিন নয়, তারা পড়তে পারবে না’।[২৩]

**পর্যালোচনা :** এখানে তিনি আবূ হুরায়রা, আবূ হুযায়ফা (?) এবং আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুম)-এর বর্ণনায় ছহীহ বুখারী এবং মুসলিমের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। বলা বাহুল্য, হুযায়ফা হবে; আবূ হুফায়ফা নয়।

(১) আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বর্ণিত হাদীছটি হলো— ‘জেনে রেখো! সে কানা। আর তোমার রব কানা নন। তার দুচোখের মাঝখানে কাফের লেখা থাকবে’।[২৪]

(২) হুযায়ফা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর হাদীছটি ছহীহ মুসলিমে আছে।[২৫] তার পূর্বেই দাজ্জাল সম্পর্কে বলা হয়েছে, الدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى جُفَالُ الشَّعَرِ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَار ‘দাজ্জালের বাম চোখ কানা, ঘন চুলবিশিষ্ট হবে। তার সাথে জান্নাত এবং জাহান্নাম থাকবে। তার জাহান্নাম হলো জান্নাত। আর তার জান্নাত হলো জাহান্নাম’।[২৬] দাজ্জাল মানুষ হবে বলেই তার মাথার চুলের কথা এ হাদীছে এসেছে। অন্যত্রও বারবার তার ব্যক্তি হওয়া সম্পর্কে স্পষ্ট হাদীছ এসেছে।

(৩) আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বর্ণিত হাদীছ ছহীহ মুসলিমে আছে।[২৭] তার পরের হাদীছটি নাওয়াস ইবনু সাম‘আন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বর্ণিত। যেখানে স্পষ্টভাবে দাজ্জাল সম্পর্কে বলা হয়েছে, إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ ‘নিশ্চয়ই সে মধ্যবয়স্ক যুবক’।[২৮] বারবার তাকে ‘মানুষ’ বলার পরও এখানে দাজ্জাল দ্বারা ‘ইয়াহূদী-খ্রিষ্টান’-কে উদ্দেশ্য করার কারণ বোধগম্য নয়।

*(চলবে)*

---

২২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৩৪।
২৩. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা!, পৃ. ৪৫।
২৪. ছহীহ বুখারী, হা/৭১৩১।
২৫. ছহীহ মুসলিম, হা/২৮৩৪।
২৬. ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৩৪।
২৭. ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৩৬।
২৮. ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৩৭।

বন্ধ্যাত্ব, ব্যাথা, ক্যান্সার
সাইনুসাইটিস, আই.বি.এস, টনসিলাইটিস
পাইলস্, ফ্যাটি লিভার, থ্যালাসেমিয়া
সহ অন্যান্য জটিল রোগীর চিকিৎসা সেবা

হোমিও মেডিসিন ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ
ডাঃ মোঃ রুহুল আমিন সরকার
বি.এইচ.এম.এস (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
এম.পি.এইচ (পুড্রু বিশ্ববিদ্যালয়)
ডি.এম.ইউ (বি.টি.ই.বি, ঢাকা)
সি.সি.পি (বি.এন.এম.সি, ঢাকা)
সি.এ.এম (বি.ইউ.এ.বি, ঢাকা)
উচ্চতর প্রশিক্ষণ (ভারত)
সহযোগী অধ্যাপক
রংপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, রংপুর
প্রাক্তন হাউজ ফিজিশিয়ান
গভ. হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, ঢাকা
গভ. রেজিস্ট্রেশন নং: এইচ-৪২৮, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

রংপুর চেম্বার
রুহুল হোমিও সেন্টার
পি.বি রোড, জাহাজ কোম্পানী মোড়, রংপুর
(রবি থেকে বৃহস্পতিবার)

গাইবান্ধা চেম্বার
রাইয়ান হোমিও সেন্টার
বড় মসজিদের সামনে, পুরাতন বাজার, গাইবান্ধা
(প্রতি শনিবার)

সিরিয়ালের জন্য
01767 222 000

# যিলহজ্জ মাসের আমল

*-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন**

আল্লাহ তাআলার নিকট যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও মর্যাদাপূর্ণ সময়। অতএব, এ ১০ দিন বেশি বেশি করে ভালো আমল করতে হবে। যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনে যেসব নেক আমল করা যেতে পারে—

**১. তাকবীর, তাহমীদ ও তাহলীল পাঠ করা :**

এ দিনসমূহে অন্যান্য আমলের মাঝে যিকিরের এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ وَلاَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘এ ১০ দিনে (নেক) আমল করার চেয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে প্রিয় ও মহান কোনো আমল নেই। তোমরা এ সময়ে তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) তাকবীর (আল্লাহ আকবার) তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ) বেশি করে আদায় করো’।[১]

এ দিনগুলোতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহত্ত্ব ও বড়ত্ব ঘোষণার উদ্দেশ্যে তাকবীর, তাহমীদ, তাহলীল ও তাসবীহ পাঠ করা সুন্নাত। এ তাকবীর প্রকাশ্যে ও উচ্চৈঃস্বরে মসজিদ, বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট, বাজারসহ সর্বস্থানে উচ্চ আওয়াজে পাঠ করা হবে। কিন্তু মহিলারা নিচুস্বরে পাঠ করবে। আর এ তাকবীরের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত প্রচারিত হবে এবং ঘোষিত হবে তাঁর অনুপম তা‘যীম।

كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوْقِ فِيْ أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيْرِهِمَا.

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) ও আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে বাজারে যেতেন ও (উচ্চৈঃস্বরে) তাকবীর পাঠ করতেন, লোকজনও তাঁদের অনুসরণ করে তাকবীর পাঠ করতেন।[২]

যিলহজ্জের প্রথম দশকের দিনগুলোতে পঠনীয় তাকবীর হচ্ছে—

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ.

এ ছাড়া অন্যান্যরূপেও তাকবীর পাঠ করার কথা জানা যায়। কিন্তু আমাদের জানা মতে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে কোনো সুনির্দিষ্টরূপ তাকবীর ছহীহভাবে বর্ণিত হয়নি। যা কিছু এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে তা সবই ছাহাবীগণের আমল।[৩]

ইমাম ছানআনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘তাকবীরের বহু ধরন ও রূপ রয়েছে, বহু ইমামও কিছু কিছুকে উত্তম মনে করেছেন। যা থেকে বুঝা যায় যে, এ বিষয়ে প্রশস্ততা আছে। আর আয়াতের সাধারণ বর্ণনা এটাই সমর্থন করে’।[৪]

**২. ছিয়াম পালন করা :**

যিলহজ্জের প্রথম নয় দিনে ছিয়াম পালন করা মুসলিমের জন্য উত্তম। কারণ, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ দিনগুলোতে নেক আমল করার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর উত্তম সব আমলের মধ্যে ছওম অন্যতম। নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও এই নয় দিনে ছিয়াম পালন করতেন।

**৩. চুল, নখ প্রভৃতি কর্তন না করা :**

যিলহজ্জের চাঁদ উঠার পর থেকে কুরবানীদাতা চুল, নখ ইত্যাদি কাটতে পারবে না। উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا وَفِي رِوَايَةٍ فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفْرًا وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ.

‘তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখলে, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক শুরু হয়ে গেলে সে যেন নিজের চুল ও চামড়ার কোনো কিছু না ধরে অর্থাৎ না কাটে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, সে যেন কেশ স্পর্শ না করে ও নখ না কাটে। অপর এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের নব চাঁদ দেখবে ও কুরবানী করার নিয়্যত করবে, সে যেন নিজের চুল ও নিজের নখগুলো কর্তন না করে’।[৫]

**৪. হজ্জ ও উমরা আদায় করা :**

হজ্জ হলো ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মূল স্তম্ভের একটি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ ‘মানুষের মাঝে যাদের সেখানে (মক্কায়) যাবার সামর্থ্য রয়েছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সে ঘরের (কা‘বা) হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য এবং কেউ যদি প্রত্যাখ্যান করে সে জেনে রাখুক নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন’ *(আলে ইমরান, ৩/৯৭)*।

---

* শিবগঞ্জ, বগুড়া।

১. মুসনাদে আহমাদ, হা/৬১৫৪, সনদ ছহীহ।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৯৬৯।

৩. ইরওয়াউল গালীল, ৩/১২৫।

৪. সুবুলুস সালাম, ২/১২৫।

৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৭৭; নাসাঈ, হা/৪৩৬৪; ইবনু মাজাহ, হা/৩১৪৯; আহমাদ, হা/২৬৪৭৪; ছহীহুল জামে, হা/৫২০।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ 'পাঁচটি স্তম্ভের ওপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। এ কথার ঘোষণা দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোনো মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, ছালাত ক্বায়েম করা, যাকাত আদায় করা, (মক্কা মুকাররমায় অবস্থিত কা'বার) হজ্জ করা, রামাযানে ছিয়াম পালন করা'।[৬] নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ 'যে ব্যক্তি হজ্জ করেছে, তাতে কোনো অশ্লীল আচরণ করেনি ও কোনো পাপে লিপ্ত হয়নি, সে যেন সে দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে, যে দিন তার মা তাকে প্রসব করেছে'।[৭] হাদীছে আরও এসেছে,

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا. وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'এক উমরা থেকে অন্য উমরাকে তার মধ্যবর্তী পাপসমূহের কাফফারা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আর কলুষমুক্ত (গৃহীত) হজ্জের পুরস্কার হলো জান্নাত'।[৮] আর এ হজ্জ যিলহজ্জ মাস ছাড়া অন্য কোনো মাসে আদায় করা যায় না।

**৫. আরাফার দিনে ছিয়াম পালন করা :**

এ দিনে ছিয়াম পালন করা সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আবূ ক্বাতাদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ 'আমি আরাফার দিনের ছওমের বিনিময় আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে বিগত ও আগত বছরের গুনাহের ক্ষমার আশা করি'।[৯]

মনে রাখতে হবে, আরাফার দিনে ছওম তারাই রাখবেন যারা হজ্জ পালনরত নন। যারা হজ্জ পালনে রত, তারা আরাফার দিনে ছওম পালন করবেন না। আরাফার দিনে হজ্জ পালনরত ব্যক্তি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ অনুসরণ করেই সে দিনের ছওম পরিত্যাগ করবেন। যেন তিনি আরাফাতে অবস্থানকালীন সময় বেশি বেশি করে যিকির, দু'আসহ অন্যান্য আমলে তৎপর থাকতে পারেন।

নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'সবচেয়ে উত্তম দু'আ হলো আরাফার দিনের দু'আ। আর সর্বশ্রেষ্ঠ কথা যা আমি বলি ও নবীগণ বলেছেন, তা হলো, لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোনো মা'বূদ নেই। তিনি একক তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই আর সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান'।[১০]

ইমাম খাত্ত্বাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, দু'আ করার সাথে সাথে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রশংসা ও তাঁর মহত্ত্বের ঘোষণা দেওয়া উচিত'।[১১]

আরাফার দিন গুনাহ মাফ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের দিন। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ 'আরাফার দিন আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের এত অধিক সংখ্যক জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন, যা অন্য দিনে দেন না। তিনি এ দিনে বান্দাদের নিকটবর্তী হন ও তাদের নিয়ে ফেরেশতাগণের কাছে গর্ব করে বলেন, 'তোমরা কি বলতে পার— আমার এ বান্দাগণ আমার কাছে কি চায়?'[১২]

**৬. ঈদের ছালাত আদায় করা :**

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ছালাত গুরুত্ব দিয়ে আদায় করেছেন। কোনো ঈদে ছালাত পরিত্যাগ করেননি। বরং একে গুরুত্ব দিয়ে তিনি মহিলাদেরকেও এ ছালাতে অংশগ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ মর্মে হাদীছে বলা হয়েছে—

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

উম্মে আত্বিয়া (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদেশ করেছেন— আমরা যেন মহিলাদেরকে ঈদুল ফিত্বর ও ঈদুল আযহাতে ছালাতের জন্য বের করে দেই; পরিণত বয়স্কা, ঋতুবতী ও গৃহবাসিনী সবাইকে। ঋতুবতী মহিলারা ছালাত আদায় থেকে বিরত থাকবে কিন্তু কল্যাণ ও মুসলিমদের দু'আ প্রত্যক্ষ করতে অংশ নেবে। তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে কারো কারো ওড়না নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'সে তার অন্য বোন থেকে ওড়না নিয়ে পরিধান করবে'।[১৩]

**৭. কুরবানী করা :**

এ দিনগুলোর দশম দিন সামর্থ্যবান ব্যক্তির কুরবানী করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কুরবানী করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ 'আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করুন ও কুরবানী করুন' *(আল-কাওছার, ১০৮/২)*।

*(বাকী অংশ৩৩ নং পৃষ্ঠা)*

৬. ছহীহ মুসলিম, হা/১২২।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/ ১৪৪৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৫০।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/ ১৭৭৩।
৯. ছহীহ মুসলিম, হা/২৮০৩।
১০. তিরমিযী, হা/২৮৩৭; মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/৫০০, সনদ ছহীহ।
১১. ইমাম খাত্ত্বাবী, শান আদ-দু'আ, পৃ. ২০৬।
১২. ছহীহ মুসলিম, হা/৩৩৫৪।
১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/২০৯৩।

# ঈদুল আযহার তাৎপর্য

*-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ**

**ভূমিকা :**

মুসলিমদের অন্যতম বৃহৎ উৎসব ঈদুল আযহা বা কুরবানীর ঈদ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ ‘আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানীর এক বিশেষ রীতি-পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি, যেন তারা ওসব পশুর উপর আল্লাহর নাম নিতে পারে, যেসব আল্লাহ তাদেরকে দান করেছেন’ *(আল-হজ্জ, ২২/৩৪)*। কবির ভাষায়—

‘ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন
ঐ খুনের খুঁটিতে কল্যাণকেতু লক্ষ্য ঐ তোরণ’।

ঈদুল আযহা ও কুরবানী মুসলিমদের শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, বরং পরিশুদ্ধ জীবন গঠনের নিয়মতান্ত্রিক অনুশীলনও বটে। এর মাধ্যমে একজন মুসলিম তাওহীদী আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ইখলাছ ও তাক্বওয়া অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের অপূর্ব নজির স্থাপন করতে পারে। যিলহজ্জ মাসের ১০ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে এই ইবাদত পালন করতে হয়।

**নামকরণ :**

হজ্জ মৌসুমে উদযাপিত ঈদকে ইসলামী পরিভাষায় ঈদুল আযহা বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ নামকরণ করেছেন। এছাড়া ‘ইয়াওমুন নাহর’ও বলা হয়। আফগানিস্তানসহ এই উপমহাদেশের অধিকাংশ লোকেরা কুরবানীর ঈদ নামে অভিহিত করেন।

‘আযহা’ শব্দটিকে আরবীতে ‘কুরব’ও বলা হয়ে থাকে, যা ফারসী বা উর্দূতে ‘কুরবানী’রূপে পরিচিত হয়েছে। কুরব-এর শাব্দিক অর্থ হলো— ১. নৈকট্য অর্জন করা। ২. কাছাকাছি যাওয়া। পরিভাষায় ‘কুরবানী’ ওই মাধ্যমকে বলা হয়, যার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য হাছিল হয়। প্রচলিত অর্থে— আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শারঈ ত্বরীকায় যে পশু যবেহ করা হয়, তাকে ‘কুরবানী’ বলা হয়।

**ইতিহাস :**

আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম-এর দুই পুত্র কাবীল ও হাবীলের দেওয়া কুরবানী থেকেই কুরবানীর ইতিহাসের গোড়াপত্তন হয়েছে। তারপর থেকে বিগত সকল উম্মতের উপর এই বিধান ছিল। আমাদের উপর যে কুরবানীর নিয়ম নির্ধারিত হয়েছে, তা মূলত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কর্তৃক শিশু পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহর জন্য কুরবানী দেওয়ার অনুসরণে। মক্কা নগরীর জনমানবহীন ‘মিনা’ প্রান্তরে আল্লাহর দুই আত্মনিবেদিত বান্দা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তুলনাহীন ত্যাগের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তাই ‘ঈদুল আযহা’ বা কুরবানীর ঈদ।

**ঈদুল আযহার গুরুত্ব :**

কুরআন-হাদীছে এ ব্যাপারে যথেষ্ট তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ ‘আর কুরবানীর পশুসমূহকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছি। এর মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে’ *(আল-হজ্জ, ২২/৩৬)*। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেন, ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ ‘আর আমরা তাঁর (ইসমাঈলের) পরিবর্তে যবেহ করার জন্য দিলাম একটি মহান কুরবানী। আমরা এটিকে পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিলাম’ *(আছ-ছাফফাত, ৩৭/১০৭-১০৮)*। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেন, ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ ‘তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করো এবং কুরবানী করো’ *(আল-কাওছার, ১০৮/২)*। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا ‘সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়’।[১]

এটি ইসলামের একটি ‘মহান নিদর্শন’ যা ‘সুন্নাতে ইবরাহীম’ হিসাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে মদীনায় প্রতি বছর আদায় করেছেন এবং ছাহাবীগণও নিয়মিতভাবে কুরবানী করেছেন। অতঃপর ধারাবাহিকভাবে মুসলিম উম্মাহর সামর্থ্যবানদের মধ্যে এটি আজ পর্যন্ত চালু আছে। এটি কিতাব ও সুন্নাহ এবং ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত।

**ঈদুল আযহার তাৎপর্য :**

ঈদুল আযহা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, বিবি হাজেরা ও ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর পরম ত্যাগের স্মৃতি বিজড়িত উৎসব। এজন্য ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কে কুরআনুল কারীমে মুসলিম জাতির পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে *(আল-হজ্জ, ২২/৭৮)*। তাই ঈদুল আযহার দিন সমগ্র মুসলিম জাতির এই সুন্নাত পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রাণপণ চেষ্টা করে। যিলহজ্জ মাসে হজ্জ উপলক্ষ্যে সমগ্র পৃথিবী থেকে লাখ লাখ মুসলিম সমবেত হয় ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর স্মৃতি বিজড়িত মক্কা-মদীনায়। হজ্জ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের এক অনন্য উদাহরণ। যা প্রতি বছরই

---

* মুহিমনগর, চৈতনখিলা, শেরপুর।

১. ইবনু মাজাহ, হা/৩১২৩।

আমাদেরকে তাওহীদী প্রেরণায় উজ্জীবিত করে। আমরা নিবিড়ভাবে অনুভব করি বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব।

ঈদের উৎসব একটি সামাজিক উৎসব, সমষ্টিগতভাবে আনন্দের অধিকারগত উৎসব। ঈদুল আযহা উৎসবের একটি অঙ্গই হচ্ছে কুরবানী। কুরবানী হলো আত্মশুদ্ধির এবং পবিত্রতার মাধ্যম। আমাদের বিত্ত, সংসার ও সমাজ তাঁর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত এবং কুরবানী হচ্ছে সেই নিবেদনের একটি প্রতীক। মানুষ কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হতে চায়। আল্লাহর জন্য মানুষ তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ত্যাগ করতে রাজী আছে কি-না সেটাই পরীক্ষার বিষয়। কুরবানী আমাদেরকে সেই পরীক্ষার কথাই বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর কাছে আল্লাহর পরীক্ষাও ছিল তাই। হালাল পশু কুরবানী করেই আমরা সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি।

**কুরবানী একটি প্রতীক :**

কুরবানী আল্লাহর জন্য আত্মত্যাগের একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। সারা বছরই আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রত্যাশায় নিজ সম্পদ অন্য মানুষের কল্যাণে ত্যাগ করতে হবে। এই ত্যাগের মনোভাব যদি গড়ে ওঠে, তবে বুঝতে হবে কুরবানীর ঈদ সার্থক হয়েছে। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ বারবার ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের উপার্জিত হালাল মালের কিছু অংশ এবং আমি যা তোমাদের জন্য যমীন হতে বের করেছি তার অংশ ব্যয় করো’ *(আল-বাক্বারা, ২/২৬৭)*।

মানবতার সেবায় সরকারের পাশাপাশি সকল বিত্তশালী লোককে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের কথা বিবেচনা করে মানুষকে সাহায্য করতে হবে।

**ঈদুল আযহার লক্ষ্য :**

ধনী-গরীব সকলের সাথে সদ্ভাব, আন্তরিকতা এবং বিনয়-নম্র আচরণ করা। মুসলিমদের জীবনে এই সুযোগ সৃষ্টি হয় বছরে মাত্র দু’বার। ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা একই কাতারে দাঁড়িয়ে পায়ে পা এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুই রাকআত ঈদের ছালাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে যায়। পরস্পরে কুশল বিনিময় করে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়, জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় এবং আন্তরিক মহানুভবতায় পরিপূর্ণ করে। মূলত ঈদুল আযহার লক্ষ্য, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে দৈন্য, হতাশা তা দূরীকরণ। যারা অসুখী এবং দরিদ্র তাদের জীবনে সুখের প্রলেপ দেওয়া।

**ঈদুল আযহার বা কুরবানীর শিক্ষা :**

কবির ভাষায়— ‘তোরা ভোগের পাত্র ফেলরে ছুঁড়ে, ত্যাগের তরে হৃদয় বাঁধ’।

মানুষ আল্লাহর জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করবে, এই শিক্ষাই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আমাদের জন্য রেখে গেছেন। আর ঈদুল আযহার মূল আহ্বান হলো সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ করা। আল্লাহর ভালোবাসার চাইতে যে পুত্রের ভালোবাসা বড় নয়, এটিই প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ এটাই চেয়েছিলেন। আর এটাই হলো প্রকৃত তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-কে কুরবানী করে এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যাতে অনাগত ভবিষ্যতের অগণিত মানুষ আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের বাস্তব শিক্ষা লাভ করতে পারে। আল্লাহই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, তাঁর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনই প্রকৃত মুমিনের কাজ এবং তাতেই নিহিত রয়েছে অশেষ কল্যাণ ও প্রকৃত সফলতা।

জনৈক উর্দূ কবি বলেন— ‘যদি আমাদের মাঝে ফের ইবরাহীমের ঈমান পয়দা হয়, তাহলে অগ্নির মাঝে ফের ফুলবাগানের নমুনা সৃষ্টি হতে পারে’।

মহান আল্লাহর তাওহীদ বা এককত্ব বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠা করা কুরবানীর অন্যতম শিক্ষা। কারণ, একমাত্র বিশ্বজাহানের মালিক মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে, তাঁর নামেই পশু কুরবানী দেওয়া হয়। জগতের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যেখানে তাদের মনগড়া উপাস্যদের নামে কুরবানী করে, সেখানে মুসলিম সমাজ কুরবানী দেয় একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে।

কুরবানীর গুরুত্বপূর্ণ আরও শিক্ষা হলো, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ। আল্লাহর সকল আদেশের সামনে বিনা প্রশ্নে মাথানত করে দেওয়াই হলো পূর্ণ আত্মসমর্পণের সমুজ্জ্বল বহিঃপ্রকাশ। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পুত্র ঈসমাইল আলাইহিস সালাম-এর এরূপ পূর্ণ আত্মসমর্পণের চিত্রই পবিত্র কুরআনুল কারীমে দেখতে পাই।

ইখলাছ ছাড়া পরকালীন কোনো কাজই আল্লাহ তাআলা কবুল করেন না। আন্তরিকতা ও ভালোবাসা-বর্জিত ইবাদত প্রাণহীন কাঠামো মাত্র। তাই কুরবানীও একমাত্র আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার নিকট কুরবানীর পশুর গোশত ও রক্ত পৌঁছায় না। তার নিকট তোমাদের তাক্বওয়া (ইখলাছ) পৌঁছায়’ *(আল-হজ্জ, ২২/৩৭)*। ইখলাছপূর্ণ কুরবানী হওয়ার কারণেই আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর কুরবানী কবুল করে নিয়েছিলেন।

কুরবানীর আরও একটি শিক্ষা হলো, দরিদ্র ও অনাথের সুখ-দুঃখে ভাগীদার হওয়া। ঈদুল আযহার ছালাতে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের সহাবস্থানের পাশাপাশি আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও দরিদ্র-ইয়াতীমের মধ্যে কুরবানীর গোশত বণ্টন আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, আমাদের সম্পদে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের অধিকার রয়েছে।

পরিশেষে ঈদুল আযহার খুশী ও আত্মত্যাগের বার্তা বয়ে যাক প্রতিটি মুসলিম মিল্লাতের ঘরে ঘরে— এই কামনা মহান প্রভুর নিকট। আমীন! ছুম্মা আমীন!

# অমনোযোগী পুত্রের প্রতি পিতার হৃদয় নিংড়ানো উপদেশ

*মূল : আবুল ফারজ ইবনুল জাওযী* রাহিমাহুল্লাহ

*-অনুবাদ : আব্দুল কাদের বিন রইসুদ্দীন**

(শেষ পর্ব)

**উপদেশ-১২ : সালাফে ছালেহীনের চরিত্র**

পূর্ণতায় পৌঁছার জন্য তোমার হিম্মত উঁচু হওয়া দরকার। কেননা, অনেক মানুষ শুধু দুনিয়াবিমুখতা নিয়ে ব্যস্ত আছে। অনেক মানুষ শুধু জ্ঞান চর্চায় ব্যস্ত আছে। তবে এমন মানুষের সংখ্যা খুব কমই রয়েছে যারা পরিপূর্ণ ইলম ও পরিপূর্ণ আমলের মাঝে সমন্বয় ঘটাতে পেরেছেন।

জেনে রেখো বৎস! আমি তাবেঈ ও তাদের পরবর্তীদের জীবনীর পাতা উল্টিয়ে দেখেছি, কিন্তু তাদের মাঝে চারজনকে পরিপূর্ণতার সবচেয়ে উচ্চ স্তরে পেয়েছি। তারা হলেন— সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, হাসান আল-বাছরী, সুফিয়ান ছাওরী ও আহমাদ ইবনু হাম্বাল। তারাও তো মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাদের মাঝে এমন হিম্মত ছিল, যা আমাদের মাঝে ক্ষীণ হয়ে গেছে। সালাফে ছালেহীনের মাঝে এমন অনেক লোক ছিলেন, যাদের মাঝে ছিল সুউচ্চ হিম্মত। তাদের জীবনী দেখতে চাইলে তুমি 'ছিফাতুছ ছফওয়া' কিতাবটি খুলে দেখো। চাইলে তুমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, হাসান আল-বাছরী, সুফিয়ান ছাওরী ও আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহিমাহুমুল্লাহ -এর জীবন-বৃত্তান্ত নিয়ে গবেষণা করতে পার। আমি এদের প্রত্যেকের জীবনী নিয়ে একটি করে কিতাব রচনা করেছি।

**উপদেশ-১৩ : মূলধন জমিয়ে রাখো, মুনাফা খরচ করো**

বাবা! তুমি জানো যে, আমি ১০০টি কিতাব রচনা করেছি। তার মধ্যে কয়েকখানা হলো— (ক) তাফসীরে কাবীর (২০ খণ্ডে)। (খ) তারীখ (২০ খণ্ডে)। (গ) তাহযীবুল মুসনাদ (২০ খণ্ডে)।

এছাড়া অন্য ছোট-বড় কিতাবগুলো কোনোটা পাঁচ খণ্ডে, কোনোটা দুই খণ্ডে, কোনোটা চার খণ্ডে, কোনোটা এর চেয়ে বেশি, কোনোটা বা কম খণ্ড হবে। এই কিতাবগুলোই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। কারো থেকে ধার নেওয়ার প্রয়োজন হবে না কিংবা কিতাব সংগ্রহ করা দরকার হবে না। সুতরাং তোমার কাজ হলো মুখস্থ করা! কেননা, মুখস্থই হলো মূলধন। আর জ্ঞান বিতরণ করাটা হলো মুনাফা। আর উভয় ক্ষেত্রে তুমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করো। তাঁর হালাল-হারামের সীমারেখার ব্যাপারে যত্নবান হও। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর, তাহলে তিনিও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন' *(মুহাম্মাদ, ৪৭/৭)*। তিনি বলেন, 'তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব' *(আল-বাক্বারা, ২/১৫২)*। তিনি বলেন, 'তোমরা আমার ওয়াদা পূর্ণ করো, তাহলে আমিও তোমাদের ওয়াদা পূর্ণ করব' *(আল-বাক্বারা, ২/৩০)*।

আর তুমি আমলবিহীন ইলম অর্জন করা হতে সাবধান থাকো। যারা রাজা-বাদশাদের দরবারে যায় এবং দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তারা ইলম অনুযায়ী আমল করা থেকে গাফেল থাকে। ফলে তারা ইলমের বরকত ও এর মাধ্যমে উপকার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়।

**উপদেশ-১৪ : ইলম ও আমল পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত**

বিনা ইলমে ইবাদতে মশগূল হওয়া থেকে সাবধান থাকো। কেননা, ইলম ছাড়া আমল করতে গিয়ে অনেক ছূফী-সন্ন্যাসী সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তুমি তোমার মনকে মার্জিত বসনে আবৃত রাখো। তার উচ্চমান যেন তোমাকে দুনিয়াদারদের সামনে প্রসিদ্ধ না করে। আবার তার নিম্নমান যেন তোমাকে ছূফী-সাধকদের মাঝে অনুরূপ না করে। আর প্রতিটি পলকে, প্রতিটি শব্দের উচ্চারণে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে নিজের হিসাব মিলাও। কেননা, এই সকল বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে।

আর একটি কথা খুব গুরুত্বের সাথে স্মরণ রাখো, তোমার বিদ্যা দিয়ে তুমি যতটুকু উপকার গ্রহণ করবে, তোমার শ্রোতাগণও ঠিক ততটুকুই উপকৃত হবে। বক্তা যদি নিজ বিদ্যা অনুযায়ী আমল না করে, তাহলে তার উপদেশবাণী মানুষের হৃদয় থেকে ছিটকে পড়বে, পানি যেভাবে পাথরের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে। অতএব সৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত কখনও উপদেশ দিবে না, সৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত কখনও পথ চলবে না। এমনকি সৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত এক গ্রাস খাবারও মুখে উঠাবে না। সালাফে ছালেহীনের জীবনী অধ্যয়ন করো, সবগুলো বিষয় তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

**উপদেশ-১৫ : শ্রেষ্ঠ রচনাবলি**

(ক) 'মিনহাজুল মুরীদীন' বইটি তোমার পড়া জরুরী। এটি তোমাকে আচার-আচরণ ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে। তাই এ বইটিকে তোমার সঙ্গী ও উস্তায বানিয়ে নাও।

(খ) 'ছয়দুল খাত্বির' বইটি অধ্যয়ন করো। এতে তুমি এমন সব ঘটনা সম্পর্কে জানবে, যা তোমার দ্বীন এবং দুনিয়ার বিষয়াবলিকে সংশোধন করে দিবে।

(গ) 'জুম্নাতুন নাযার' বইটি মুখস্থ করো। এটি তোমার ফিক্বহ বুঝার দক্ষতা অর্জনে যথেষ্ট হবে।

(ঘ) 'আল-হাদায়েক' কিতাবটিতে সময় দিলে অধিকাংশ হাদীছ তোমার অবগতিতে চলে আসবে।

(ঙ) 'আল-কাশফ' কিতাবটিতে দৃষ্টি দিলে ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের হাদীছগুলোর অস্পষ্টতা তোমার কাছে স্পষ্ট হবে।

(চ) অনারবদের লিখিত তাফসীরগুলোতে মনোযোগ দিয়ো না। কারণ 'আল-মুগনী' ও 'যাদুল মাসীর' গ্রন্থদ্বয়ে তাফসীরের ক্ষেত্রে তোমার প্রয়োজন হবে এমন কোনো বিষয় বাদ পড়েনি।

(ছ) আর আমি তোমার জন্য নছীহতের যে সকল কিতাব রচনা করেছি, সেগুলোর বাইরে তোমার অতিরিক্ত কিতাবের প্রয়োজন হবে না।

**উপদেশ-১৬ : কল্যাণকামী বক্তার গুণাবলি**

সাধারণ মানুষ থেকে দূরে থাকো, কিন্তু তাদের সাথে সদাচরণ বজায় রাখো। কেননা, অসৎ সঙ্গীর সাথে থাকার চেয়ে একাকী থাকা বেশি প্রশান্তিদায়ক এবং মান-সম্মান ধরে রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক।

বিশেষ করে একজন বক্তাকে যেন অতি নমনীয় না দেখায় কিংবা বাজারে অহেতুক ঘোরাফেরা করা অথবা হাসি-তামাশা করতে না দেখা যায়। তার সম্পর্কে যেন মানুষের সুধারণা সৃষ্টি হয় এবং তার বক্তব্যে মানুষ উপকৃত হয়। যদি বাধ্য হয়ে মানুষের সাথে মিশতে হয়, তাহলে বুদ্ধিমত্তার সাথে মিশবে। কারণ তাদের স্বভাব-চরিত্রের কথা তাদের মুখের উপরে প্রকাশ করে দিলে তাদের সাথে সদাচরণ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

**উপদেশ-১৭ : হক্বদারের কাছে হক্ব পৌঁছিয়ে দাও**

স্ত্রী, সন্তান, নিকটাত্মীয়সহ প্রত্যেক হক্বদারের কাছে হক্ব পৌঁছিয়ে দাও। তোমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কী নিয়ে সে বিদায় হচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য রাখো। যথাসম্ভব সর্বোত্তম জিনিস ছাড়া তাকে বিদায় দিও না। মনের ব্যাপারে অবহেলা করো না। সর্বোত্তম ও সুন্দরতম আমলের প্রতি তাকে অভ্যস্ত করে তোলো। কবর নামক সিন্দুকে এমন কিছু পাঠাও, সেখানে পৌঁছলে যা দেখে তুমি আনন্দিত হবে। যেমন বলা হয়—

ওহে যারা দুনিয়া নিয়ে আছো ব্যস্ত
উচ্চাকাঙ্ক্ষা যাকে করেছে ধোঁকাগ্রস্ত
মৃত্যু কবে হঠাৎ করে আসবে চলে
আর কবর তো হলো সিন্দুক আমলের।

কাজের শেষ ফলাফলের কথা মাথায় রাখো, তাহলে পছন্দনীয় কিংবা অপছন্দনীয় সকল ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা তোমার পক্ষে সহজ হবে। যদি কখনও মনের মাঝে গাফলতি অনুভব কর, তাহলে মনকে কবরস্থানে ঘুরিয়ে নিয়ে আসো, তাহলে পরকালের পথে আসন্ন যাত্রার কথা স্মরণ হবে।

আল্লাহই সবকিছুর পরিচালক। তথাপি তোমার কার্য পরিচালনা করো— কোনো অপচয়-অপব্যয় না করে, যেন তোমাকে মানুষের দ্বারস্থ না হতে হয়। কেননা, সম্পদ রক্ষা করা দ্বীনেরই অংশ। এটা এজন্য যে, মানুষের দ্বারস্থ হওয়ার চেয়ে ওয়ারিছদের জন্য কিছু রেখে যাওয়া উত্তম।

**উপদেশ-১৮ : শুভ সমাপ্তি**

জেনে রাখো বাবা, আমরা আবূ বকর ছিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর বংশধর। আমাদের পিতা হলেন ক্বাসেম ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আবূ বকর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু। তার জীবন-বৃত্তান্ত 'ছিফাতুছ ছফওয়া' গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

অতঃপর আমাদের উত্তরসূরীরা ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পরবর্তীদের মাঝে আমি ছাড়া এমন কেউ নেই, যাদেরকে জ্ঞানান্বেষনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেওয়া হয়েছিল। এখন জ্ঞানার্জনের বিষয়টি তোমার উপর বর্তিয়েছে। তুমি জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও, যেন তোমার সম্পর্কে আমার আশা ভঙ্গ না হয়। আমি তোমাকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করলাম। তারই কাছে দু'আ করি, যেন তিনি তোমাকে ইলম এবং আমলের তাওফীক্ব দান করেন।

তোমাকে সদুপদেশ দেওয়ার জন্য আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করলাম। সুউচ্চ সুমহান আল্লাহর হুকুম ছাড়া পাপ কাজ থেকে বাঁচার এবং আনুগত্য করার ক্ষমতা কারোই নেই। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি প্রশংসাকারীদের নিয়ামত বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

# কুরআন-সুন্নাহর আলোকে
# মৃত মুসলিমদের জন্য নিবেদিত আমলসমূহের প্রতিদান

*মূল : ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী* রহিমাহুল্লাহ

*অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন**

(পর্ব-৫)

**২৬তম দলীল :** আবূ রাফে‘ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা-কালো রংমিশ্রিত খাসি[১] করা দুটি দুম্বা কুরবানী করলেন। অতঃপর বললেন, দুটি কুরবানীর একটি হলো তাদের জন্য, যারা তাওহীদ এবং রিসালাত পৌঁছিয়ে দেয়ার সাক্ষ্য দেয়। অপরটি হলো তাঁর এবং তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে। বর্ণনাকারী বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিলেন। মুসনাদে আহমাদের একটি বর্ণনায় রয়েছে, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুরবানী করতেন, তখন তিনি মোটাতাজা শিংওয়ালা সাদা-কালো রংমিশ্রিত দুটি দুম্বা ক্রয় করতেন। যখন তিনি ছালাত পড়ে খুৎবা শেষ করতেন, এ সময় তিনি ঈদগাহে অবস্থান করতেন। তখন তাঁর কাছে দুটি দুম্বার একটি আনা হলে নিজেই ছুরি[২] দিয়ে কুরবানী করতেন এবং বলতেন ‘হে আল্লাহ! এ কুরবানীটি আমার সকল উম্মতের পক্ষ হতে যারা আপনার জন্য একত্বের সাক্ষ্য দেয় এবং আমার জন্য রিসালাত পৌঁছানোর সাক্ষ্য দেয়। অতঃপর অপর দুম্বাটি আনা হলে তিনি নিজেই কুরবানী করলেন এবং বললেন, এই কুরবানীটি মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবারের পক্ষ হতে। মিসকীনরা এ কুরবানী সম্পূর্ণ খেয়ো। তিনি এবং তাঁর পরিবার দুটি কুরবানী থেকে খেয়েছে। আমরা কয়েক বছর অবস্থান করেছি, কিন্তু বানূ হাশেম গোত্রের কোনো ব্যক্তি নেই যে, সে কুরবানী করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ঋণে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে যথেষ্ট করেছেন’।[৩]

**মৃত মুসলিমদের জন্য নিবেদিত আমলসমূহের প্রকারভেদ :**
জীবিত মুসলিম ব্যক্তি তার সৎ আমলসমূহের ছওয়াব হাদিয়া দিলে মৃত মুসলিম ব্যক্তির কাছে সে ছওয়াবগুলো পৌঁছে যাবে। ইতোপূর্বে এ বিষয়ের প্রমাণাদি উল্লেখ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে আমি আলেমদের বেশ কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করব। এ উদ্ধৃতিগুলো দিয়ে তারা যা প্রমাণ করেন, সেগুলোও নিম্নে উল্লেখ করব।

**প্রথমত,** ইমাম ইবনু কুদামাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ، نَفَعَهُ ذَلِكَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَمَّا الدُّعَاءُ، وَالِاسْتِغْفَارُ، وَالصَّدَقَةُ، وَأَدَاءُ الْوَاجِبَاتِ، فَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، إِذَا كَانَتْ الْوَاجِبَاتُ مِمَّا يَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ ‘মানুষ যে কোনো সৎআমল সম্পাদন করুক না কেন, তার ছওয়াব মৃত মুসলিম ব্যক্তিকে উৎসর্গ করা হলে মৃত ব্যক্তি তা দ্বারা উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ। মৃত ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করা, ক্ষমা চাওয়া, দান করা এবং ওয়াজিব পালন করার ক্ষেত্রে আমার জানা মতে কোনো আলেমদের কোনো মতানৈক্য নেই। ওয়াজিব আমলসমূহ পালন করা মৃত ব্যক্তির ওয়াজিবগুলোর স্থলাভিষিক্ত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ ‘(এ সম্পদ তাদের জন্যও) যারা অগ্রবর্তীদের পরে (ইসলামের ছায়াতলে) এসেছে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আর আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করো, যারা ঈমানের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রবর্তী হয়েছে, আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বড়ই করুণাময়, অতিদয়ালু’ *(আল-হাশর, ৫৯/১০)*। তিনি আরও বলেন, ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾ ‘কাজেই জেনে রেখো, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার ভুলত্রুটির জন্য আর মুমিন ও মুমিনাদের জন্য, আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে অবগত’ *(মুহাম্মাদ, ৪৭/১৯)*। আবূ সালামাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু মৃতবরণ করলে তার জন্য’[৪] আর যাদের জানাযার ছালাত পড়িয়েছেন, তাদের জন্য নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু‘আ করেন। যা আওফ ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর হাদীছে উল্লেখ রয়েছে’।[৫] প্রত্যেক

---

* নারায়ণপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

১. موجبين : মাজমাঊয যাওয়ায়েদ, ৪/২২-এ موجوءين রয়েছে।

২. المدية-এর শাব্দিক অর্থ : বড় ছুরি। এটাই প্রসিদ্ধ রয়েছে’; দেখুন : আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার, ২/৯৭১, মূল অক্ষর ‘سكن’।

৩. মুসনাদে আহমাদ, ৬/৮, ৬/৩৯১; আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, হা/১১৪৭-এ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

৪. ছহীহ মুসলিম, ‘জানাযা’ অধ্যায়, ‘মৃত ব্যক্তির দৃষ্টি বন্ধ করা এবং মৃত্যু উপস্থিত হলে তার জন্য দু‘আ করা’ অনুচ্ছেদ, হা/৯২০।

৫. ছহীহ মুসলিম, ‘জানাযা’ অধ্যায়, ‘জানাযার ছালাতে মৃত ব্যক্তির জন্য দু‘আ করা’ অনুচ্ছেদ, হা/৯৬৩।

মৃত ব্যক্তি যাদের তিনি জানাযার ছালাত পড়িয়েছেন, তাদের জন্য এবং বীরদের দাফন করার সময় তাদের জন্য দু'আ করেছেন'।[৬]

যাদের তিনি জানাযার ছালাত পড়েছেন, তাদের জন্য প্রার্থনা অল্লাহ তাআলা শরীআতসম্মত করেছেন। জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার মাতা মারা গেছেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান-ছাদাক্বা করি, তাহলে কি তিনি উপকৃত হবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, উপকৃত হবেন'।[৭] সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীছ'।[৮]

জনৈক মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট আসলেন অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর যে হজ্জ ফরয করেছেন, তা আমার বৃদ্ধ পিতার উপরও ফরয হয়েছে, যখন তিনি সওয়ারীর উপর ঠিকভাবে বসে থাকতে সক্ষম নন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বললেন, 'তুমি এ ব্যাপারে কী মনে কর- যদি তোমার পিতার উপর ঋণ থাকত, তাহলে কি তুমি তা আদায় করতে না?' তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ'।[৯]

যে ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আমার মা এক মাসের ছিয়াম ক্বাযা আদায় না করে মারা গেছেন। আমি কি তার পক্ষ হতে ছিয়াম পালন করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ছিয়াম পালন করো'।[১০]

এ হাদীছগুলো ছহীহ। এ হাদীছগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তি সমস্ত সৎ আমলের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারবে। কেননা, ছিয়াম, হজ্জ, দু'আ, ক্ষমা চাওয়া এগুলো দৈহিক ইবাদত। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা মৃত ব্যক্তির কাছে এ ইবাদতগুলোর ছওয়াব পৌঁছিয়ে দিবেন। অনুরূপভাবে দৈহিক ইবাদত ছাড়াও অন্যান্য ইবাদতের মাধ্যমেও মৃত ব্যক্তি উপকৃত হতে পারবে। আমর ইবনু শুআইব হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা, তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ আমর ইবনুল আছকে বললেন, لَوْ كَانَ أَبُوكَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ أَوْ بَلَغَهُ ذَلِكَ 'সে (তোমার পিতা) যদি মুসলিম হতো, তাহলে তোমরা তার পক্ষ থেকে দাসমুক্তি করলে বা ছাদাক্বা করলে কিংবা হজ্জ করলে তার কাছে এর ছওয়াব পৌঁছত'।[১১] মৃত ব্যক্তির কাছে ছওয়াব পৌঁছানো বিষয়টি নফল হজ্জ ও অন্যান্য সৎকর্মের ক্ষেত্রে ব্যাপক বিষয়। কেননা, এগুলো হলো সৎ ও মহৎ আমল। তাই এ আমলগুলোর ছওয়াব ও প্রতিদান মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছাবে। যেমন— ছাদাক্বা, ছিয়াম এবং ফরয হজ্জ...'।[১২]

অতঃপর ইমাম ইবনু কুদামাহ রহিমাহুল্লাহ তাদের কথা প্রত্যাখান করেছেন, যারা বলেন, মৃত ব্যক্তির কাছে ওয়াজিব আমলগুলো, দান-ছাদাক্বা, দু'আ, ক্ষমা চাওয়া ছাড়া অন্য কিছুই পৌঁছে না। তারপর তিনি বর্ণনা করেন, মুসলিমরা অস্বীকার করা ছাড়াই মৃতদের ছওয়াব হাদিয়া (উপহার) দেয়। কেননা, নবী ﷺ হতে ছহীহ হাদীছে এসেছে, إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ 'নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের ক্রন্দনের (বিলাপের) কারণে শাস্তি দেওয়া হয়'।[১৩] আল্লাহ হলেন মৃতদের নিকটে পাপের শাস্তি পৌঁছাতে এবং ছওয়াব হতে বঞ্চিত করতে ক্ষমতাবান। মুসলিমরা যে ছওয়াবগুলো হাদিয়া (উপহার) দেয়, সেগুলো তিনি মৃতদের নিকটে পৌঁছিয়ে দেন। আর যে ছওয়াবগুলো তাদের কাছে পৌঁছাতে বাধা দেয়, সেগুলোও পৌঁছাতে তিনি ক্ষমতাবান। ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ 'আর মানুষ তাই পায়, যা সে করে' *(আন-নাজম, ৫৩/৩৯)*। উক্ত আয়াতটি তারা যা দেয়, তার সাথে বিশেষিত। এ বিষয়ে এ অর্থে আমরা মতানৈক্য করি না, বরং আমরা অনুমান করে থাকি'।[১৪]

তিনি আরও বলেন, মৃতদের নিকট ছওয়াব না পৌঁছানোর ব্যাপারে তারা যে হাদীছগুলোর প্রমাণ দিয়ে থাকে, সেগুলো তাদের প্রমাণ নয়। যেমন, إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ 'যখন কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তিনটি আমল ছাড়া (তার নিকট) সকল প্রকার আমলের ছওয়াব যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ছাদাক্বা জারিয়া এমন জ্ঞান রেখে যাওয়া যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় ও এমন সৎ সন্তান যে তার জন্য দু'আ করবে'।[১৫] এ হাদীছটি মৃত ব্যক্তির আমল বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রমাণ করে। কিন্তু যে আমলগুলো তাদের হাদিয়া (উপহার) দেওয়া হয়, সেগুলো তাদের আমলের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই 'মৃতদের নিকটে ছওয়াব পৌঁছাবে না' প্রমাণিত হয় না...'।[১৬]

*(চলবে)*

---

৬. ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, ৩/৫২১।
৭. ছহীহ বুখারী, 'জানাযা' অধ্যায়, 'হঠাৎ মৃত্যু' অনুচ্ছেদ, হা/১৩৮৮; ছহীহ মুসলিম, 'যাকাত' অধ্যায়, 'মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দান করে তার জন্য ছওয়াব পৌঁছানো' অনুচ্ছেদ, হা/১০০৪; আবূ দাঊদ, হা/২৮৮২।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/২৭৫৬; আবূ দাঊদ, হা/২৮৮২, আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।
৯. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৫৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৪, আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।
১০. ছহীহ বুখারী, 'ছিয়াম' অধ্যায়, 'ছিয়ামের ক্বাযা রেখে যিনি মারা যান' অনুচ্ছেদ, হা/১৯৫৩; ছহীহ মুসলিম, 'ছিয়াম' অধ্যায়, 'মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ছিয়াম পালন করা' অনুচ্ছেদ, হা/১১৪৮, আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।
১১. আবূ দাঊদ, 'অছিয়ত' অধ্যায়, 'মৃত কাফেরের অছিয়ত পূর্ণ করা মুসলিম ওলীর জন্য অত্যাবশ্যাক কি না' অনুচ্ছেদ, হা/২৮৮৩; আলবানী রহিমাহুল্লাহ সিলসিলা ছহীহা, হা/৩১৬১-তে হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।
১২. ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, ৩/৫২১, ৫২২; শারহুল কাবীর, ৬/২৫৭,২৬৫; আল-কাফী, ২/৮২।
১৩. ছহীহ বুখারী, 'জানায' অধ্যায়, 'রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিকট কান্নাকাটি করা' অনুচ্ছেদ, হা/১৩০৪; ছহীহ মুসলিম, 'জানাযা' অধ্যায়, 'মৃতের নিকট কান্নাকাটি করা' অনুচ্ছেদ, হা/৯২৪।
১৪. ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, ৩/৫২২ (সংক্ষেপিত)।
১৫. ছহীহ মুসলিম, 'অছিয়ত' অধ্যায়, 'মানুষের মৃত্যুর পর যে সকল আমলের ছওয়াব তার কাছে পৌঁছে' অনুচ্ছেদ, হা/১৬৩১; মিশকাত, হা/২০৩।
১৬. আল-মুগনী, ৩/৫২১, ৫২২; শারহুল কাবীর, ৬/২৫৭, ২৬৫; আল-কাফী, ২/৮২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩১, অলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

# ঈমান ভঙ্গের কারণ

-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

**(৫) ইসলামের কোনো বিধানকে অপছন্দ করা :**

কোনো ঈমানদার ইসলামের কোনো বিধান অপছন্দ করলে সাথে সাথে তার ঈমান চলে যাবে। কোনো অবস্থাতেই কেউই ইসলামের কোনো বিধানকে অপছন্দ করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি', অথচ তারা মুমিন নয়' *(আল-বাক্বারা, ২/৮)*। আল্লাহ আরও বলেন, 'আর যারা কাফের তাদের জন্য রয়েছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দিবেন। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা পছন্দ করে না। অতএব তাদের কর্মসমূহ আল্লাহ ব্যর্থ করে দিবেন' *(মুহাম্মাদ, ৪৭/৮-৯)*।

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, ঈমান এনে বা না এনে আমলসমূহ বাতিল হওয়ার অন্যতম কারণ আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয় অপছন্দ করা। এ বিষয়ে ঈমানদার হয়ে আমল করলেও অপছন্দ করার কারণে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। অর্থাৎ কারো পর্দার বিধান ভালো লাগে না যদিও সে পর্দা করে অথবা কারো জিহাদের কথা ভালো লাগে না অথবা পুরুষদের একাধিক বিয়ের অনুমতিও ভালো লাগে না। যদি কারো বিশ্বাস এমন হয়, তাহলে তার ঈমান চলে যাবে।

**(৬) দ্বীনের কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা :**

কোনো ঈমানদার ইসলামকে নিয়ে বা ইসলামের কোনো বিধিবিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করলে তার ঈমান চলে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর যদি আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বলুন, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে?' *(আত-তওবা, ৯/৬৫)*। অন্যত্র আল্লাহ আরও বলেন, 'তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরী করেছ। যদি আমি তোমাদের থেকে একটি দলকে ক্ষমা করে দেই, তবে অপর দলকে আযাব দেব। কারণ, তারা হচ্ছে অপরাধী' *(আত-তওবা, ৯/৬৬)*।

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ স্পষ্ট করে দিলেন যে, আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও তাঁর আয়াত নিয়ে কেউ যদি খেল-তামাশা, বিদ্রুপ, মজা ইত্যাদি করে, তাহলে তার ঈমান চলে যাবে। যেমন— অনেকে দাড়ি রাখা, টাকনুর উপর প্যান্ট পরা, বিভিন্ন বিদআতী কর্মকাণ্ডে জড়িত না হওয়া নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, যা কখনোই উচিত নয়। আল্লাহ আরও বলেন, 'সুতরাং যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে না, আমি তাদেরকে তাদের দুষ্টামিতে ব্যতিব্যস্ত করে রাখি' *(ইউনুস, ১০/১১)*।

তারা আল্লাহ না চাইলে কখনোই হেদায়াত পাবে না। দুষ্টুমিতেই জীবন পার হবে। সুতরাং তাদের সাথে চলাফেরা করা ও যোগাযোগ রাখা যাবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, 'আর (আল্লাহ) কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারী করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ করতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে। অন্যথা তোমরাও তাদেরই মতো হয়ে যাবে। আল্লাহ মুনাফিক্ব ও কাফেরদেরকে জাহান্নামে একই জায়গায় সমবেত করবেন' *(আন-নিসা, ৪/১৪০)*।

তাদের বন্ধুরূপেও গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্য কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হও। আর যখন তোমরা ছালাতের জন্য আহ্বান কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা মনে করে। কারণ তারা নির্বোধ' *(আল-মায়েদা, ৫/৫৭-৫৮)*।

সুতরাং দ্বীন নিয়ে যারাই হাসি-ঠাট্টা করবে, তাদের থেকে তৎক্ষণাৎ দূরত্ব সৃষ্টি করতে হবে। কেননা দ্বীন নিয়ে তামাশাকারীরা হচ্ছে মুনাফিক্ব। আর মুনাফিক্বদের জায়গা হচ্ছে জাহান্নামে।

**(৭) জাদুটোনা বা কুফরী কালাম করা :**

আল্লাহর উপর বিশ্বাসের পরিবর্তে কেউ যদি জাদুটোনা বা শয়তানী কুফরী কাজের মাধ্যমে কিছু পেতে চায় বা কারো ক্ষতি করতে চায়, তাহলে তা হবে সম্পূর্ণ ঈমান বিধ্বংশের

* পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

কাজ। কুফরী কাজের দ্বারা যত ভালো কাজই হোক না কেন, ইসলামে সকল প্রকার জাদুটোনা হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তারা অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা সুলায়মানের রাজত্বে পাঠ করত। আর সুলায়মান কুফরী করেনি; বরং শয়তানরা কুফরী করেছে। তারা মানুষকে জাদু শেখাত এবং (তারা অনুসরণ করেছে) যা নাযিল করা হয়েছিল বাবেলের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর। আর তারা কাউকে শেখাত না যে পর্যন্ত না বলত যে, 'আমরা তো পরীক্ষাস্বরূপ, সুতরাং তোমরা কুফরী করো না। এরপরও তারা এদের কাছ থেকে শিখত, যার মাধ্যমে তারা পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ তারা তার মাধ্যমে কারো কোনো ক্ষতি করতে পারত না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আর তারা শিখত যা তাদের ক্ষতি করত, তাদের উপকার করত না এবং তারা অবশ্যই জানত যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, আখেরাতে তার কোনো অংশ থাকবে না। আর তা নিশ্চিতরূপে কতই-না মন্দ, যার বিনিময়ে তারা নিজদেরকে বিক্রয় করেছে। যদি তারা জানত' *(আল-বাক্বারা, ২/১০২)*।

অতএব, যারাই এসব করে, তাদের আর ঈমানের অস্তিত্ব থাকে না। আজ উপমহাদেশের বহু মানুষই জাদুটোনা ও কুফরী কালামে লিপ্ত।

**(৮) ইসলামের বিপক্ষে কাফেরদের সাহায্য করা :**

কোনো ঈমানের দাবিদার যদি ইসলামের বিপক্ষে কাফের-মুশরিকদের সাহায্য-সহযোগিতা করে, তাহলে তার ঈমান চলে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই যালেম' *(আত-তওবা, ৯/২৩)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে তাদের (বিধর্মীদের) সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ তাআলা যালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না' *(আল-মায়েদা, ৫/৫১)*।

অতএব, কখনোই বিধর্মীদের আন্তরিক বন্ধু করা যাবে না। সেই সাথে যারা ইসলামের বিপক্ষে বা কোনো মুসলিমের বিপক্ষে বিধর্মীদের সাহায্য-সহযোগিতা করবে, তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।

**(৯) কাউকে দ্বীন ইসলাম এবং শরীআতের ঊর্ধ্বে মনে করা :**

কেউ যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনীত শরীআতের বিধিবিধান মানার চাইতে অন্য কোনো পীর-বুজুর্গের দেওয়া (শরীআত বহির্ভূত) কাজ করে বা করাকে জায়েয মনে করে তাহলে তাঁর ঈমান থাকবে না। কেননা শরীআতের ঊর্ধ্বে কেউ নেই। ইসলামে যা কিছু চলবে সবই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ এবং সম্মতিতে।

এখন কেউ যদি পীর-ওলী-আউলিয়াকে শরীআতের উৎস ধরে (স্বপ্নের বার্তা, কাশফ) সেইমতো বিভিন্ন বিধিবিধান চালু এবং পালন করে, তাহলে তার ঈমান থাকবে না। কেননা ইসলামে একমাত্র অনুসরণ হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর। আল্লাহ তাআলা বলেন, '(হে রাসূল! আপনি) বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তবে আমার অনুসরণ করো; তাহলেই আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(আলে ইমরান, ৩/৩১)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ আরও বলেন, 'তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ করো এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের (শরীআত বহির্ভূত কারোর) অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর' *(আল-আ'রাফ, ৭/৩)*।

অর্থাৎ আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাইলে একমাত্র রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করতে হবে। রাসূল ﷺ-এর প্রদর্শিত পথ ছাড়া অন্য কারো অনুসরণ করা যাবে না।

**(১০) শরীআতের বিধিবিধানে কম-বেশি বা নতুনত্ব সৃষ্টি করা :**

কেউ যদি মনে করে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল কর্তৃক আনীত ইসলামের বিধানে নতুন করে কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করলে ভালো হবে। অথবা কেউ যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেওয়া শরীআতের নির্ধারিত বিধিবিধানে (ঈমান, আক্বীদা, আমলে) কম-বেশি বা নতুনত্ব (বিদআত) সৃষ্টি করে বা জায়েয মনে করে এবং সেইমতো আমলও করে, তাহলে তার ঈমান চলে যাবে।

নতুনত্ব আনা বা বাদ দেওয়ার মধ্যে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাতকে অস্বীকার করে। এর দ্বারা আল্লাহ যে তাঁর রাসূল ﷺ দ্বারা ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেটা মিথ্যা হয়ে যাওয়া। অথচ আল্লাহ বলেন, 'যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলিমের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিকে সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থল' *(আন-নিসা, ৪/১১৫)*।

এটা দ্বারা সুস্পষ্ট যে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি মানুষকে একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে দ্বীন ইসলামে জীবনযাপন করতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম' *(আল-মায়েদা, ৫/৩)*।

*(বাকী অংশ৩৮ নং পৃষ্ঠা)*

# কুরবানীর ইতিহাস

*-অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন**

আরবী কুরব বা কুরবান (قرب বা قربان) শব্দটি উর্দূ ও ফার্সীতে (قربانی) কুরবানী নামে রূপান্তরিত। কুরবানীর অর্থ হলো— নৈকট্য বা সান্নিধ্য লাভ করা, নিকটবর্তী হওয়া, উৎসর্গ করা, উপঢৌকন, সান্নিধ্য লাভের উপায়, ত্যাগ করা, পশুত্বকে বিসর্জন দেওয়া ইত্যাদি। মূলত কুরবানী শব্দটি বাংলায় ব্যবহৃত আরবী ভাষার একটি প্রতিশব্দ। কুরআনুল কারীমে কুরবানীর একাধিক সমার্থক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন: (১) নাহর (نحر), এ অর্থে আল্লাহ বলেন, ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ ‘(হে নবী!) আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য ছালাত এবং কুরবানী করুন’ *(আল-কাওছার, ১০৮/২)*। এ কারণে কুরবানীর দিনকে (يوم النحر) বলা হয়। (২) নুসুক (نسك), এ অর্থে আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ ‘আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু; সবই বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য’ *(আল-আনআম, ৬/১৬২)*। (৩) মানসাক (منسك), এ অর্থে আল্লাহ বলেন, ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً﴾ ‘আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানীর বিধান রেখেছি’ *(আল-হাজ্জ, ২২/৩৪)*। আবার (৪) (الأضحى) অর্থে হাদীছের ভাষায় কুরবানীর ঈদকে ( عيد الأضحى) ‘ঈদুল আযহা’ বলা হয়।

**কুরবানীর ইতিহাস :**

কুরবানীর ইতিহাস অতি প্রাচীন। পৃথিবী নামক ভূখণ্ডে মানব সৃষ্টির শুরুর দিকেই পৃথিবীর প্রথম মানব এবং প্রথম নবী আদম আলাইহিস সালাম-এর সময় থেকেই কুরবানীর প্রচলন শুরু হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ ‘আদম আলাইহিস সালাম-এর দুই পুত্রের (হাবীল ও কাবীলের) বৃত্তান্ত আপনি তাদেরকে যথাযথভাবে শোনান। যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল। তখন একজনের কুরবানী কবুল হলো এবং অন্যজনের কুরবানী কবুল হলো না। (যার কুরবানী কবুল হয়নি সে) বলল, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব। (অপরজন) বলল, আল্লাহ তো সংযমীদের কুরবানীই কবুল করে থাকেন’ *(আল-মায়েদা, ৫/২৭)*। পৃথিবীর ইতিহাসে আদম আলাইহিস সালাম-এর পুত্রদ্বয় হাবীল ও ক্বাবীলের কুরবানীই প্রথম, যাতে হাবীলের কুরবানী গৃহীত হয় আর ক্বাবীলেরটা হয় প্রত্যাখ্যাত। সে যুগে কুরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন ছিল এই যে, আসমান থেকে একটি আগুন এসে কুরবানী নিয়ে অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কুরবানীকে উক্ত অগ্নি গ্রহণ করত না, সে কুরবানীকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হতো।

ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেক যুগেই কুরবানীর এ বিধান সব শরীআতেই বিদ্যমান ছিল। মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাস থেকে জানা যায়, পৃথিবীতে যুগে যুগে সব জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ কোনো না কোনোভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার প্রিয় বস্তু উৎসর্গ করতেন। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রিয়বস্তু উৎসর্গই আজকের প্রচলিত কুরবানী। এ কথার প্রমাণে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾ ‘আমি প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য (কুরবানীর) নিয়ম করে দিয়েছি। তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যে রিযিক্ব দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর উপর তারা যেন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে (এই বিভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতির মূল লক্ষ্য কিন্তু এক আল্লাহর নির্দেশ পালন)। কারণ তোমাদের মা‘বূদই একমাত্র উপাস্য। কাজেই তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করো আর সুসংবাদ দাও সেই বিনীতদেরকে’ *(আল-হজ্জ, ২২/৩৪)*।

**আমাদের জন্য প্রণীত কুরবানীর ইতিহাস :**

মুসলিম উম্মাহ প্রতি বছর ১০ যিলহজ্জ যে কুরবানী দিয়ে থাকেন, এর প্রচলন এসেছে নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম থেকে। আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কে তাঁর প্রাণপ্রিয় সন্তানকে কুরবানীর নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সে হুকুম

* পিএইচডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পালন করে সফল হয়েছিলেন। মুসলিম মিল্লাতের পিতা নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর কুরবানীর পর থেকে মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে তাঁর এ নির্দেশ কুরবানীর বিধান পালন করে আসছেন।

ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে জানা যায়, স্বপ্নে আল্লাহর নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর নিজ পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর সম্মতিতে কুরবানী করার মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি পুত্র ইসমাঈলকে নিয়ে মিনার একটি নির্জন স্থানে যান। অতঃপর কুরবানী করার জন্য পুত্রকে শোয়ান। কিন্তু আল্লাহ তার নির্দেশ পালনের প্রতি পিতা এবং পুত্রের অপরিসীম ত্যাগ স্বীকারে খুশি হন এবং শিশু ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-কে রক্ষা করেন। আর আল্লাহর তরফ থেকে পাঠানো একটি মেষকে (ভিন্ন মত দুম্বা) শিশু ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর পরিবর্তে কুরবানী করা হয়। কুরবানীর এ নির্দেশের বর্ণনায় কুরআনে আল্লাহ বলেন, ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ ‘অতঃপর যখন সে (শিশু ইসমাঈল) তার (পিতা ইবরাহীম) এর সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছল, তখন সে (পিতা ইবরাহীম) বলল, হে প্রিয় বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি, অতএব এ ব্যাপারে তোমার কী অভিমত? সে (শিশু ইসমাঈল) বলল, হে আমার পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তাই করুন। আমাকে ইনশা-আল্লাহ আপনি অবশ্যই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন’ *(আছ-ছাফফাত, ৩৭/১০২)*। আল্লাহ আরও বলেন, ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ ‘অতঃপর বাবা-ছেলে উভয়েই যখন আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাকে যবেহ করার জন্য তাকে (শিশু ইসমাঈলকে) কাত করে শুইয়ে দিলেন’ *(আছ-ছাফফাত, ৩৭/১০৩)*। আল্লাহ আরও বলেন, ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ - قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ‘তখন আমি (আল্লাহ) ডেকে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করে দেখালে। নিশ্চয়ই আমি এভাবে সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি’ *(আছ-ছাফফাত, ৩৭/১০৪-১০৫)*। আল্লাহ আরও বলেন, ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ - وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ ‘নিশ্চয়ই এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আর আমি (আল্লাহ) তার (ইবরাহীমের) সন্তান কুরবানীর পরিবর্তে যবেহযোগ্য এক মহান জন্তু দিয়ে কুরবানী করিয়ে তাকে (ইবরাহীমের সন্তানকে) মুক্ত করে নিলাম’ *(আছ-ছাফফাত, ৩৭/১০৬-১০৭)*। আল্লাহ আরও বলেন, ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ ‘আর এ (কুরবানীর) বিষয়টি পরবর্তীদের জন্য স্মরণীয় করে রাখলাম’ *(আছ-ছাফফাত, ৩৭/১০৮)*।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা কতই না মহান! যিনি তাঁর বন্ধু নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কে প্রিয় সন্তান কুরবানীর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনিও তার নির্দেশ পালনে নিজ সন্তানকে যবেহ করার জন্য শুইয়ে দিয়েছেন। আর তিনি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তারপর থেকেই মুসলিম উম্মাহ কুরবানীর এ বিধান পালন করে আসছেন।

**আমাদেরকে মনে রাখতে হবে :**

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর বন্ধুত্ব মহান আল্লাহর প্রতি কত গভীর ছিল তা একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম যখন চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলেন, তখন প্রায় ১০০ বছরের বৃদ্ধ নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। তখন তিনি আল্লাহ তাআলার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সে সময় মিনা প্রান্তরে প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকে কুরবানীর নির্দেশ পালন করেছিলেন। আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে তার মানসিকতা আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে গিয়েছিল। যা আজও মুসলিম উম্মাহ প্রতি বছর যিলহজ্জ মাসের ১০ থেকে ১৩ তারিখ এই চার দিনের যেকোনো একদিন পশু কুরবানীর মাধ্যমে পালন করে থাকেন।

প্রথম মানব নবী আদম আলাইহিস সালাম থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্যই কুরবানীর বিধান বলবৎ ছিল। মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণে আজও সারা বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা প্রতি বছর ওই বিধান যথাযথ ধর্মীয় অনুশাসন মেনেই পালন করছেন। আর এর মাধ্যমেই মুসলিম সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে, সাদা চোখে কুরবানীর মাধ্যমে নিরীহ পশুকে যবেহ করার বিষয়টি দৃশ্যমান হলেও বাস্তবিক পক্ষে ওই পশু কুরবানীর মধ্যেই মানুষের জন্য রয়েছে প্রভূত কল্যাণ ও সমৃদ্ধি। কুরবানীর অন্তর্নিহিত শিক্ষাকে যদি মুসলিমরা উপলব্ধি ও ধারণ করতে পারে, তবে তখনই কেবল কুরবানী অর্থ শুধু পশু যবেহ নয়, বরং এর সুদূর প্রসারী মানব কল্যাণ।

# মেহমান ও মেজবানের শিষ্টাচারসমূহ

*অনুবাদ : মাহবূবুর রহমান মাদানী*

*[১ শাওয়াল, ১৪৪৩ হি. মোতাবেক ২ মে, ২০২২। পবিত্র হারামে মাক্কীর (কা'বা) 'ঈদুল ফিত্বর'-এর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ ড. ছালেহ বিন আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ** প্রফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহীর সম্মানিত সিনিয়র শিক্ষক **শায়খ মাহবূবুর রহমান মাদানী**। খুৎবাটি **'মাসিক আল-ইতিছাম'**-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

## প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, সমস্ত প্রশংসা সকল কিছুকে সৃষ্টিকারী আল্লাহর জন্য। 'আল্লাহু আকবার' আল্লাহ মহান, যিনি সকল প্রাণীর রিযিক্বদাতা। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যার রহমতের এবং ক্ষমার প্রত্যাশা করা যায়। 'আল্লাহু আকবার' আল্লাহ মহান। তিনি কত কল্যাণ ঢেলে দিয়েছেন এবং কত অপ্রীতিকর জিনিস দূর করেছেন। তিনিই প্রথম বা আদি, তাঁর পূর্বে কিছুই নেই। তিনিই সর্বশেষ, তাঁর পর কিছুই নেই। তিনিই সবার ওপরে, তাঁর ওপরে কিছুই নেই। তিনি নিকটে, তাঁর চেয়ে নিকটে আর কেউ নেই। আল্লাহর বাণী, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ 'কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সব শোনেন, সব দেখেন' *(আশ-শূরা, ৪২/১১)*। অন্য আয়াতে এসেছে, ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ 'তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, তাঁর সত্তা ছাড়া সকল কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁরই, আর তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তি হবে' *(আল-ক্বাছাছ, ২৮/৮৮)*। আর আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক; তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি মৃত্যু দান করেন এবং জীবন দান করেন। তিনি হাসান, তিনি কাঁদান। তিনি সম্পদশালী করেন আর তিনি সম্পদ সংকুচিত করেন। তিনি সুখী করেন, তিনি দুঃখী করেন। তাঁর নেয়ামতসমূহ অবারিতভাবে অবতীর্ণ হয়। আল্লাহর বাণী, ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ 'আল্লাহ, তিনি ব্যতীত সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, সুন্দর নামসমূহ তাঁরই' *(ত্বো-হা, ২০/০৮)*।

আমি আরও সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আমাদের নেতা, আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল, তিনি হেদায়াত, আলো ও সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন। তিনি সদাচারণ, ন্যায়নিষ্ঠতা ও আল্লাহভীতির আদেশ দিয়েছেন। তিনি সর্বশেষ নবী। যে ব্যক্তি তাঁর উপরে একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার ওপর ১০ বার রহমত বর্ষণ করবেন। অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি, তাঁর পুতপবিত্র পরিবার-পরিজন, তাঁর সকল ছাহাবী, তাবেঈ এবং ন্যায়নিষ্ঠভাবে যারা তাদের অনুসরণ করবেন, তাদের প্রতি।

الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا.

অতঃপর, হে মুসলিম সম্প্রদায়! আমি নিজেকে এবং আপনাদের সকলকে আল্লাহভীরুতার উপদেশ দিচ্ছি। অতএব আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহ আপনাদের প্রতি রহম করুন! আমলকে সুন্দর করুন। আপনাদেরকে যেন দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা ধোঁকায় না ফেলে। বাকী জীবনকে কাজে লাগান। আপনাদের সমসাময়িক যে সমস্ত লোক চলে গেছেন তাদের থেকে উপদেশ গ্রহণ করুন। মৃত্যু আপনাদের সবাইকে গ্রাস করবে। কবর আপনাদের সাথে আলিঙ্গন করবে। কিয়ামত আপনাদেরকে একত্রিত করবে। আর মহান আল্লাহ আপনাদের মাঝে ফয়সালা করবেন।

রামাযান মাস চলে যাওয়াতে ব্যথিত হবেন না। অচিরেই তা প্রত্যাবর্তন করবে। আপনারা আশা রাখুন। তবে ব্যথিত হবেন যদি এমন হয় যে, এই মর্যাদাপূর্ণ মাস ফিরে আসবে অথচ আপনাদের নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে প্রস্থানকারীদের খাতায়। পরপারে যাত্রার পূর্বেই নিজ আত্মার উপর সদয় হোন। জেনে রাখুন! জীবনে এখনো একটি রুকূ বা এক ফোঁটা অশ্রু ঝরানোর সুযোগ আছে। পবিত্র যবানের দু'আ, অবিচল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল এবং আল্লাহ অভিমুখী হৃদয়ের বিনয়-নম্রতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আপনাদের (প্রতিটি) আমল যেন হয় জীবনের শেষ আমল। (একদিন আপনার জন্য) অশ্রু প্রবাহিত করা হবে, এক সময় কান্নাও শেষ হয়ে যাবে, (আপনাকে রাখা হবে এমন এক ঘরে) যার প্রতিটি কোণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এটি এমন এক সময় যার প্রতিটি ঘণ্টা ও মিনিট হিসাব করা আছে। অতএব, ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করুন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ 'কাজেই তোমরা সৎকর্মে অগ্রগামী হও, তোমাদের সকলকেই আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরেকে অবহিত করবেন' *(আল-মায়েদা, ৫/৪৯)*।

বন্ধুগণ, عيدُكم مباركٌ، وتقبَّل اللهُ منا ومنكم ‘আপনাদের ঈদ হোক বরকতময়। মহান আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের থেকে সৎ আমলসমূহ কবুল করুন’। এই বরকতময় ঈদ আগমন করেছে আর আমরা বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে রয়েছি।

হে মুসলিমগণ, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। অতঃপর সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। জেনে রাখুন! এই মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুন নাবাবী শরীফ, মুসলিমদের মাসজিদসমূহ এবং ঈদের ময়দানসমূহ মুছল্লী, তাকবীর পাঠকারী এবং ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’-এর ধ্বনি উচ্চারণকারী দ্বারা ভরপুর।

হে মুসলিম সম্প্রদায়! সংকটপূর্ণ এমন কিছু দৃশ্যপট (করোনাকালীন সময়) অতিক্রান্ত হয়েছে যা মুসলিমদেরকে তাদের মাসজিদে যেতে বাঁধা দিয়েছে, মসজিদে মুছল্লী উপস্থিত না হওয়ার জন্য কোনো অশ্রু বিসর্জন দেওয়া হয়েছে, ইবাদতকারীদের সামনে মসজিদসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, মাতাফ বা তাওয়াফ করার জায়গায় কোনো তাওয়াফকারী ছিল না, সাঈ করার জায়গায় কোনো সাঈকারী ছিল না!

হে আল্লাহর বান্দা! তবে এখন প্রফুল্লচিত্তে সামনে অগ্রসর হোন। আল্লাহরই জন্য সমস্ত প্রশংসা যে, এখন আল্লাহর নিদর্শনাবলি এবং ছালাতসমূহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, কাতারসমূহ প্রাচীর সদৃশ্য হয়েছে, কাঁধ ও পাসমূহ বরাবর-সমান্তরাল করা হয়েছে।

عيدُكم مباركٌ، وتقبَّل اللهُ منا ومنكم ‘আপনাদের ঈদ হোক বরকতময়। মহান আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের থেকে ভালো কাজগুলো গ্রহণ করুন’। আমাদের ওপর আল্লাহ প্রদত্ত এই নেয়ামতের জন্য আমরা নিজেদেরকে এবং আপনাদেরকেও অভিনন্দন জানাচ্ছি। কাজেই উক্ত নেয়ামতের মূল্যায়ন ও কতৃজ্ঞতা প্রকাশ করুন। আল্লাহ বিপদ দূর করেছেন, কাজেই তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের জন্য আবশ্যক।

হে মুসলিম সম্প্রদায়! মহান এই সন্ধিক্ষণে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জানানোর অন্যতম প্রকাশ হলো— মুসলিমদের পরস্পরে অধিক পরিমাণে যোগাযোগ রক্ষা করা, নিকটাত্মীয় ও পরিচিতদের মাঝে পারস্পরিক সাক্ষাৎ বিনিময় করা।

হে মুসলিমগণ! আল্লাহ আপনাদের ওপর রহম করুন। উলামায়ে কেরাম (আল্লাহ তাদের ওপর রহম করুন) আগন্তুক বা অতিথি এবং মেযবানের কিছু ভালো শিষ্টাচার ও কর্মনীতি উল্লেখ করেছেন। এসব শিষ্টাচারগুলো গ্রহণ করলে যিয়ারত আল্লাহর ইচ্ছায় ফলপ্রসূ হবে এবং এগুলো পারস্পরিক নৈকট্য, ঘনিষ্টতা, ভালোবাসা, হৃদ্যতা ও সম্পর্ক মযবূত করার ক্ষেত্রে সহায়ক উপকরণ হিসেবে গণ্য হবে।

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا যে ব্যক্তি কোনো অসুস্থ লোককে দেখতে যায় অথবা কোনো দ্বীনি ভাইকে দেখতে যায়, তখন একজন ঘোষক (আল্লাহর ফেরেশতা) তাকে ডেকে বলতে থাকেন, কল্যাণময় হোক তোমার জীবন, কল্যাণময় তোমার এই পথ চলা এবং জান্নাতে তোমার একটি বাসস্থান নির্দিষ্ট নির্ধারিত হোক’।[১] হাদীছে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ﴾ ‘আমার ভালোবাসা সেই সমস্ত লোকের জন্য ওয়াজিব হয়েছে, যারা আমার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে, আমারই জন্য পরস্পরে বৈঠকে বসে, আমারই জন্য পরস্পরে সাক্ষাৎ করে এবং আমারই জন্য একে অন্যের জন্য খরচ করে’।

**হে মুসলিম সম্প্রদায়! অতঃপর বাড়ির মালিকের ক্ষেত্রে যিয়ারতের আদব হলো :**

(১) বাড়িওয়লার উচিত যিয়ারতকারী আসলে প্রফুল্লতা প্রকাশ করা, সুন্দরভাবে স্বাগত ও অভিনন্দন জানানো এবং তার জন্য যথাসাধ্য উদারতা দেখানো।

(২) পণ্য-সামগ্রী, খাবার-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে গর্ব-অহমিকা, বাড়াবাড়ি, কৃত্রিমতা ও ওঁৎ পেতে থাকার স্বভাব থেকে দূরে থাকা। বিশেষত নিকটতম আত্মীয়ের ক্ষেত্রে। কারণ এসব স্বভাব যিয়ারতের মূল লক্ষ্যকেই ভণ্ডুল করে দেয়।

(৩) বাড়িওয়লার উচিত যিয়ারতকারী বাড়ি ত্যাগ করা পর্যন্ত তার সাথে সঙ্গ দেওয়া। শা‘বী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, যিয়ারতকারীর যিয়ারতের পূর্ণতা হলো, বাড়ির গেট পর্যন্ত তুমি তার সাথে যাবে এবং তার বাহনের রেকাব ধরবে।

**হে মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলী! আর যিয়ারতকারী তথা মেহমানের সাথে সংশ্লিষ্ট আদব হলো :**

(১) বেশি বেশি কথোপকথন, টেলিফোন, পত্র প্রেরণ অথবা অতিমাত্রায় দরজায় কড়াঘাত করা প্রভৃতির মাধ্যমে যিয়ারতে আগ্রহের জন্য পীড়াপীড়ি করবে না।

(২) বিশ্রামের সময় অথবা ব্যস্ততার সময় অথবা কর্মের সময় যিয়ারত করা সমীচীন নয়। যিয়ারতের জন্য উত্তম সময় নির্ধারণ জরুরী।

(৩) অতিথি উত্তম চরিত্রে অলংকৃত হবে। যেমন— মেযবানের সাথে ভালো আচরণ করা, নম্রতার সাথে কথা

১. তিরমিযী, হা/২০০৮; ইবনু মাজাহ, হা/৪২১৩, হাদীছ হাসান।

বলা, হাসি-খুশি ভাব প্রকাশ করা, বক্ষ প্রশস্ত রাখা এবং সাক্ষাতের সময় হাস্যোজ্জ্বল থাকা, বাড়িওয়ালাকে তার ব্যক্তিগত বিষয়ে বেশি কিছু জিজ্ঞেস না করা। আবূ লাইস আস-সমরকন্দী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মেহমানের ওপর চারটি জিনিস ফরয— (ক) মেযবান যেখানে বসাবে সেখানেই বসবে, (খ) মেযবান উপস্থিত যা কিছু উপস্থাপন করে তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, (গ) বাড়ির মালিকের অনুমতি ছাড়া উঠবে না, (ঘ) যখন সে বের হবে তখন মেযবানের জন্য দু'আ করবে।

(৪) মেযবানকে নির্দিষ্ট কোনো খাদ্যের জন্য প্রস্তাব না দেওয়া।

(৫) মেযবানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

(৬) তার সামনে যে খাবার-পানীয় বা অন্য কিছু পেশ করা হয়, তা তুচ্ছ জ্ঞান করবে না, দোষ ধরবে না বা সেটাকে হেয় জ্ঞান করবে না। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ، أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ও কোনো ব্যক্তির মন্দ প্রমাণিত হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে তার অপর মুসলিম ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করে'।[২]

হে মুসলিম সম্প্রদায়! আপনাদের দ্বীনী ভাইয়ের অধিকার সংরক্ষণ, জামাআতবদ্ধ ও সৌহার্দপূর্ণ জীবনযাপনে আগ্রহী হোন। ভালোবাসা ও অঙ্গীকার রক্ষা এবং গোপনীয় বিষয়কে দাবিয়ে রাখার ব্যাপারে একনিষ্ঠ হোন।

আমি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় চাই।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না, অনুমতি প্রার্থনা এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম দেওয়া ব্যতীত। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হয়তো তোমরা উপদেশ করবে। সেখানে যদি তোমরা কাউকে না পাও, তাহলে তাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও, তাহলে ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য বেশি পবিত্র। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সবচেয়ে সম্যক অবগত' *(আন-নূর, ২৪/২৭-২৮)*।

الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا.

২. ইবনু মাজাহ, হা/৪২১৩, হাদীছ ছহীহ।

## দ্বিতীয় খুৎবা

আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। যাদের উপাসনা করা হয়, তন্মধ্যে তিনেই উপাসনা পাওয়ার অধিকতর হক্বদার। 'আল্লাহু আকবার'। যাদের নিকট কিছু চাওয়া যায়, তন্মেধ্যে তিনি অধিক দানশীল । সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই। যারা মানুষকে দান করেন, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। আর আমি আরও সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আমাদের নেতা, আমাদের নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি, তাঁর পরিবার, তাঁর সকল ছাহাবীর প্রতি, যারা কাফেরদের ওপর ছিলেন কঠিন আর মুমিনদের ওপর ছিলেন বিনম্র। আরও দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাবেঈন এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে যারা তাদের অনুসরণ করবে তাদের প্রতি।

الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا.

হে মুসলিমগণ! অনুগ্রহপ্রার্থীর ঈদই হলো প্রকৃত ঈদ। গর্ব-অহমিকা বা চাকচিক্যময় পোশাক দিয়ে প্রকৃত ঈদ হয় না। শুকরিয়া আদায়কারীর ঈদ হলো প্রকৃত ঈদ। অহংকারীদের ঈদ প্রকৃত ঈদ নয়। আনন্দ, পরস্পরকে ক্ষমা ও মার্জনা করার পোশাকই হলো ঈদের সর্বোত্তম পোশাক। ঈদ হলো পরস্পর আন্তরিক হওয়ার এবং অন্তরের সন্ধিস্থাপনের মূল্যবান যোগসূত্র। ঈদ হলো শত্রুতা-দুশমনীর উপকরণসমূহ দূরিকরণের মাধ্যম।

হে প্রিয় ভ্রাতৃমণ্ডলী! রামাযানের পর কল্যাণের লক্ষণ হলো, আনুগত্যের ওপর বান্দার অটল-অবিচল থাকা। রামাযানের পর শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম পালনের জন্য রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন। আর তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়ামের পর উক্ত ছয়টি ছিয়াম পালন করবে, সে যেন সারা বছর ছওম পালন করল। আল্লাহ আমাদের থেকে এবং আপনাদের থেকে ছিয়াম, ক্বিয়াম, সমস্ত আনুগত্য ও সৎ আমলগুলো কবুল করুন। রাসূলের উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী নবীর উপর দরূদ প্রেরণ করেন। (অতএব) হে মুমিনগণ, তোমরাও তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করো' *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৬)*।

এরপর শাইখ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার, চার খালীফা ও ছাহাবীদের উপর দরূদ এবং সালাম পাঠের পর নিজেদের ও সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য দু'আ করে খুৎবা শেষ করেন।

# রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ : একটি পর্যালোচনা

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(শেষ পর্ব)

**ককেশাস অঞ্চল : মুসলিমদের উপর যুলুমের দাস্তান**

ককেশাস মূলত একটি পাহাড়ের নাম। যাকে আরবীতে কোকায (القوقاز) বলা হয়। ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে পার্থক্য সৃষ্টিকারী একটি সিরিয়াল পর্বতমালার নাম ককেশাস। এই পর্বতমালাকে ঘিরেই আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, জর্জিয়া, চেচনিয়া ও দাগিস্তান নামক দেশগুলোতে বহু দিন ধরে মুসলিমরা বসবাস করে আসছে। গত দীর্ঘ ৪০০ বছর যাবৎ জার, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও রাশিয়া নিজ নিজ শাসন আমলে এই অঞ্চলের মুসলিমদের উপর যুলুম-অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোনো অঞ্চলের মুসলিমদের উপর এমন অত্যাচার-নির্যাতন করা হয়েছে বলে ইতিহাসের পাতায় আমাদের দেখা নেই। এই অঞ্চলের মুসলিমদের আলোচনা ছাড়া রাশিয়ার আলোচনা অপূর্ণাঙ্গ। নিম্নে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করছি।

**ককেশাস স্বাধীনতার শুরু :**

আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, জর্জিয়া, চেচনিয়া অঞ্চলের হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মুসলিমের বহু দিন থেকে অন্তরের স্বপ্ন যে, তারা একটি স্বাধীন দেশে বসবাস করবে। সর্বপ্রথম যিনি এই অঞ্চলের মুসলিমদের নিয়ে আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার নাম শেখ আল-মানছূর। ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তিনি এসব অঞ্চলের মানুষদেরকে একত্রিত করে তৎকালীন রুশ জার সম্রাজ্ঞী ক্যাথরিন দ্য গ্রেট এর বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেন। তৎকালীন জার সম্রাজ্ঞী ক্যাথরিন দ্য গ্রেট এই মহান মুজাহিদকে বন্দি করে নিয়ে গিয়ে ক্রেমলিনে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করেন এবং মুসলিমদের জিহাদ আন্দোলনকে দমানোর কঠোর ও ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালান। তবে যখন নেপোলিয়ান রাশিয়া আক্রমণ করে তখন কিছুদিনের জন্য মুসলিমদের উপর অত্যাচার বন্ধ থাকে।

১৮০০ শতাব্দীর দিকে এই অঞ্চলের মুসলিমদেরকে নিয়ে পুনরায় স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য জিহাদ আন্দোলন শুরু করেন ইমাম শামিল। তাকে চেচনিয়া অঞ্চলের মুসলিমদের সিংহ বলা হয়। তিনি তার সফলতার স্বীকৃতির জন্য তৎকালীন উছমানীয় খেলাফতের সহযোগিতা চেয়েছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য সেই সময় তাকে স্থানীয় খেলাফত সহযোগিতা করেনি। উছমানীয় খেলাফতের সহযোগিতা না পাওয়ার কারণে ইমাম শামিল রহিমাহুল্লাহ নিশ্চিত বিজয় হাতছাড়া করেন। দ্বিতীয়বারের মতো ককেশাস অঞ্চলের মুসলিমদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের সফল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। রাশিয়া ইমাম শামিলকে বন্দি করে নিয়ে যায়। ইমাম শামিলের প্রতি সম্মান জানিয়ে তার শেষ ইচ্ছা পূরণে তাকে সঊদী আরবের হিজাযে ফিরে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয় এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

উল্লেখ্য, জার শাসনামল পতনের সময় এবং কমিউনিজমের উত্থানের সময় এ অঞ্চলের মুসলিমরা কিছুটা স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন হওয়ার পর বাধ্যতামূলকভাবে এই অঞ্চলগুলোকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় জোসেফ স্ট্যালিন মুসলিমদেরকে সন্দেহ করে এবং সে মনে করে মুসলিমরা তার বিরুদ্ধে গোপনে সহযোগিতা করছে। রাশিয়ার বিরোধীদের সহযোগিতা করার অভিযোগে লক্ষ লক্ষ চেচেন দাগিস্তানী ও ইঙ্গুশ মুসলিমদের নির্বাসন দেওয়া হয়। শীতের বরফঢাকা রাস্তায় হাজারো মুসলিম মারা যায় এবং গৃহহীন হয়ে পড়ে।

**প্রথম চেচেন যুদ্ধ :**

জোসেফ স্ট্যালিন মৃত্যুপরবর্তী শাসকগণ চেচেনদের ফিরে আসার অনুমতি প্রদান করেন। নব্বইয়ের দশকে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে, তখন পেছনের মুসলিমরা পুনরায় স্বাধীনতার স্বাদ নেওয়ার জন্য রাশিয়ার বাইরে গিয়ে গণভোটের আয়োজন করে স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়।

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; এম. এ. (অধ্যয়নরত), উলূমুল হাদীছ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণা আসার পর রাশিয়া এই স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণা মানতে পারেনি। তারা তখন এই স্বাধীন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে। ইতিহাসের পাতায় যাকে প্রথম চেচেন যুদ্ধ বলা হয়।

এই প্রথম যুদ্ধে রাশিয়া ভয়ংকরভাবে চেচনিয়ার রাজধানী গ্রোজনিতে আক্রমণ করে এবং এক সপ্তাহব্যাপী চেচনিয়ার রাজধানী গ্রোজনিতে লুটতরাজ, মারপিট ও ধর্ষণ-গণহত্যা চালায়। যা পৃথিবীর ইতিহাসের নৃশংসতম জঘন্যতম ঘটনা বলে পরিচিত। কিন্তু রাশিয়া কখনও কল্পনা করেনি যে, চেচনিয়ার মুজাহিদগণ সাহসিকতার সাথে এত শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। সেই যুদ্ধে চেচেন মুজাহিদগণ এতটাই ভয়ংকর প্রতিরোধ গড়ে তুলে, যা রাশিয়ার মতো সুপার পাওয়ার এর জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আরব মুজাহিদ ইবনুল খাত্ত্বাব স্থানীয় মুজাহিদ শামিল বাসায়েভ এবং আফগান মুজাহিদদের সহযোগিতায় রাশিয়ার মতো সুপার পাওয়ারকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। রাশিয়া চেচেনের সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হয়। সৈন্য প্রত্যাহারসহ চেচেনদের সকল শর্ত মেনে নেয়। তখন চেচেনের প্রধানমন্ত্রী হন সালিম খান ইন্দারায়েভ।

**দ্বিতীয় চেচেন যুদ্ধ ও ভ্লাদিমির পুতিন :**

শাসনক্ষমতা গ্রহণ করার পর সালিম খান ইন্দারায়েভ জানান, তিনি আশেপাশের মুসলিম এলাকাগুলোকে বিশেষ করে দাগিস্তান অঞ্চলকে চেচেনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে চান। তার এই চিন্তা রাশিয়ার পছন্দ হয়নি। তার এই চিন্তাকে রাশিয়া তার নিজের জন্য হুমকি মনে করে। ফলে পুনরায় রাশিয়া চেচেনে হামলা করে। এবার যুদ্ধের দায়িত্ব প্রদান করা হয় বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে। তিনি ইতিহাসের ভয়ংকরতম আক্রমণ চালান চেচেনে। নৃশংসভাবে বিমান হামলা চালিয়ে অসংখ্য বেসামরিক লোককে হত্যা করেন। কূটনীতি ও সমরনীতি উভয়দিক থেকে চেচেনকে পরাস্ত করার জন্য বদ্ধপরিকার ছিলেন তিনি। কূটনীতির জন্য রমজান কাদিরভের বাবা আহমাদ কাদিরভকে বাছাই করেন। তাকে কাঠপুতলি হিসেবে ক্ষমতায় বসিয়ে স্বাধীনচেতা নেতাদেরকে গুপ্ত হত্যা শুরু করে রুশ।

যেমন আহমাদ কাদিরভ নেতৃত্ব লাভের পর সালিম খান ইন্দারয়েভে পাকিস্তান হয়ে আরব আমিরাত হয়ে কাতারে গিয়ে আশ্রয় নেন। পরবর্তীতে পুতিনের গোয়েন্দাবাহিনী গুপ্ত হামলায় সালিম খানকে হত্যা করে। এছাড়া চেচেন স্বাধীনচেতা মুজাহিদগণের মধ্যে অন্যতম সাহসিনী বোন আমিনা উকুয়োভাকেও পুতিনের গোপনবাহিনী গুপ্ত হামলায় হত্যা করে।

**উপসংহার :**

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এটাই বুঝাতে চেয়েছি যে, রাশিয়ার একচেটিয়ে সমর্থন কোনো মুসলিমের পক্ষে সম্ভব নয়। যেখানে রাশিয়ার হাতে চেচেন নিরপরাধ বেসামরিক মুসলিমদের রক্ত লেগে আছে। যদিও বর্তমান বিশ্বরাজনীতিতে রাশিয়া যাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে সেই আমেরিকা-ইউরোপ-ইসরাঈলই বর্তমানে মুসলিমদের সাথে সবচেয়ে বেশি শত্রুতা করে আসছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, কোনো সুপার পাওয়ার আমাদের বন্ধু নয়। সেই যুগে রাসূল ﷺ যেমন রোমান বা পারস্য কাউকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু মনে করেননি, বরং তাদের বিজয় করার স্বপ্ন দেখেছেন। মুসলিমদেরকেও সুপার পাওয়ারের সহযোগিতা নেওয়ার হীনম্মন্যতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। স্বপ্ন দেখতে হবে সকল সুপার পাওয়ারকে বিজয় করার। আর এটাই প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

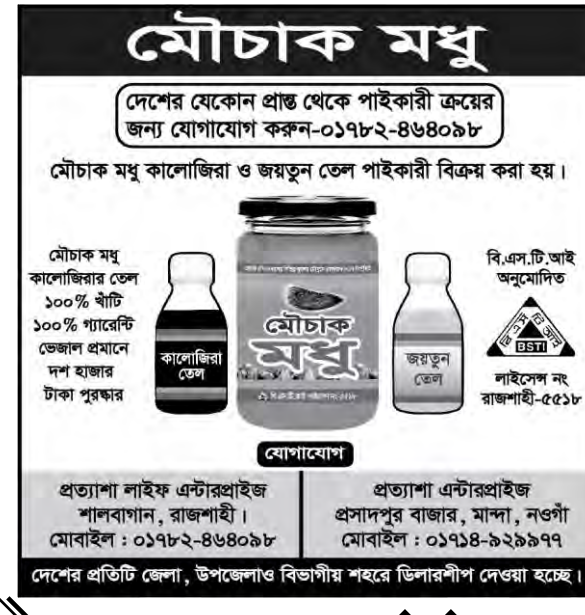

# ১১৬ জন আলেমের বিরুদ্ধে শ্বেতপত্র ও আমাদের শ্রীলংকা ভীতি

-জুয়েল রানা*

১.

সম্প্রতি একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ‘শ্বেতপত্র: বাংলাদেশে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ২০০০ দিন’ নামের একটা প্রকাশনা উন্মোচন করেছে। গত মার্চে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান খান কামাল এই শ্বেতপত্র প্রকাশনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন।

দুই মাস আগে এই শ্বেতপত্র প্রকাশিত হলেও সম্প্রতি আলোচনায় এসেছে মূলত ১১৬ জন আলেমের নাম গণমাধ্যমে প্রকাশের পর। এই শ্বেতপত্র তারা দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), জাতীয় মানবাধিকার কমিশনেও জমা দিয়েছে এবং শ্বেতপত্রে তাদের দেওয়া সুপারিশগুলো বিবেচনার অনুরোধ জানিয়েছে।

আমাদের দেশে যাদের সম্পদের হিসাব জনগণ দাবি করে তারা সেটা করেন না। মন্ত্রী-সাংসদদের হিসাব প্রকাশের কথা থাকলেও তারা করেন না। বরং ক্ষমতার পটপরিবর্তনে ক্ষমতা-হারা হয়ে যাওয়ার পর দুদকের পক্ষ থেকে তাদের অনেকের বিরুদ্ধে মামলা হয়, জেল-জরিমানাও হয়। তারাও সে পর্যন্ত অপেক্ষা করেন।

গত দুই দশকের সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ বিরোধী বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে চৌর্যবৃত্তির মাধ্যমেই প্রায় ৯০% তথ্য উক্ত শ্বেতপত্রে সংকলিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে চূড়ান্ত অসততা ও স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিয়ে এসব পুরাতন তথ্য যাচাই, সম্পাদনা বা হালনাগাদও করা হয়নি। ফলে এই শ্বেতপত্রের পাতায় পাতায় অসংখ্য ভুল তথ্য, অর্ধ সত্য ও নানা রকম অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদ বিরোধী অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামও এখানে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান স্থিতিশীল পরিবেশকে বিনষ্ট করে আলেম-উলামা ও সরকারকে মুখোমুখি করার একটি হীন, অপপ্রয়াস হিসেবেই গণকমিশন এই পদক্ষেপ নিয়েছে। হঠাৎ দৃষ্টিপটে আসা ‘মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশন’ নামক এক সংগঠন গত ১১ মে দেশের কতিপয় ওলামা মাশায়েখ ও ওয়ায়েযীনকে ‘ধর্ম ব্যবসায়ী’ আখ্যা দিয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে। ১১৬ জন আলেমের এবং এক হাজার মাদরাসার বিরুদ্ধে ২২ শত পৃষ্ঠার এই শ্বেতপত্রে অর্থ পাচার, সন্ত্রাস উসকে দেওয়া, নারীদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা ইত্যাদি নানান ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করে দুর্নীতি দমন কমিশনে তদন্তের জন্য আবেদন করা হয়। ‘গণকমিশন’-এর এসব পদক্ষেপ দেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তালিকাভুক্ত ওই সব ওলামা-মাশায়েখের সবাই দেশের সর্বোচ্চ সম্মানিত, মাননীয় এবং জনপ্রিয়। অথচ ‘গণকমিশন’-এর কর্তাব্যক্তি যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তাদের কেউ কেউ সমাজে নেতিবাচকভাবে চিহ্নিত এবং বিতর্কিত। তাদের কারো কারো বিরুদ্ধেই বরং বিভিন্ন সামাজিক অভিযোগ রয়েছে। এই সব বিতর্কিতরাই জাতির সম্মানিত ও দেশবরেণ্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। এটা জাতির জন্য দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

গত ২০ মে, ২০২২ (শুক্রবার) সকালে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে লায়ন্স ক্লাবের ২৭তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠান শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন বলেন, ‘১১৬ জনকে ধর্ম ব্যবসায়ী আখ্যা দিয়ে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সমন্বয়ে **‘মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস’ তদন্তে গঠিত গণকমিশনের অভিযোগের কোনো আইনগত ভিত্তি নেই’।**

এই ভুঁইফোঁড় সংগঠনটি বরাবরের মতোই নিজেদের ইসলামবিদ্বেষী চেহারা জাতির সামনে উন্মোচিত করেছে। তাদের এই শ্বেতপত্র যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বানোয়াট এবং মিথ্যা তথ্যে ভরপুর, এটি সমগ্র দেশবাসীর সামনে আজ দিবালোকের মতো পরিষ্কার।

২.

গত কয়েক মাস ধরেই শ্রীলংকা অর্থনৈতিক অস্থিরতায় নিমজ্জিত। দেশটিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তীব্র ঘাটতি রয়েছে। দেশটির পেট্রোল, ওষুধ এবং বৈদেশিক রিজার্ভ শেষ হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে সরকারের প্রতি ক্ষোভে ফুঁসে উঠে জনগণ রাস্তায় প্রতিবাদ করতে নামে। এক পর্যায়ে জনতা প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দ রাজাপাকসে এবং তার মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। এরপর নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। দেশটির চরম অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য দেশটির বেশিরভাগ মানুষ দুষছেন বিতর্কিত প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া রাজাপাকসা বা সংক্ষেপে ‘গোটা’কে।

* খত্বীব, গছাহার বেগ পাড়া জামে মসজিদ (১২ নং আলোকডিহি ইউনিয়ন), গছাহার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

শ্রীলংকান রাজনীতিবিদরা জনগণকে রাজনীতির নামে সস্তা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসে প্রায় দুই দশক ধরে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে দেশকে তলানিতে ঠেকিয়েছেন। আমি মনে করি যারা শাসনের নামে জনগণের ভাগ্য নিয়ে টালবাহানা করে, তাদের শ্রীলংকার রাজনৈতিক বিপর্যয় ও অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্ব থেকে শিক্ষা নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কারণ রাজনীতি কারও জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। রাজনীতি সব সময়ই পরিবর্তনশীল, এমনকি যে সমাজে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা বদলের রাস্তা নেই, সেখানেও চিরস্থায়ী ক্ষমতা বলে কিছু নেই। বিভিন্ন দেশে স্বৈরশাসকদের পতনের ইতিহাস সেদিকেই ইঙ্গিত করে। শ্রীলংকার সাথে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে মানুষের আগ্রহে কোনো ঘাটতি দেখছি না। পূর্ব ইউরোপের এই যুদ্ধ ঘিরে নানা ধরনের আলোচনা, জল্পনাকল্পনা হচ্ছে, যার একটি হচ্ছে পারমাণবিক সংঘাতের আশঙ্কা।

এতদিন পর্যন্ত রাশিয়ার আগ্রাসন এবং হত্যাযজ্ঞ থামানো যাচ্ছে না। কারণ বেশি কিছু করতে গেলে প্রেসিডেন্ট পুতিন পারমাণবিক বিস্ফোরণ বা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারেন- এই ভয়ে। এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে পারমাণবিক অস্ত্র কাদের কাছে নিরাপদ? আমেরিকা ইরাক ধ্বংস করেছিল পারমাণবিক অস্ত্র আছে বলে। এমনকি তারা ইরানকেও ওই একই অজুহাত দিয়ে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। যদি ইরাক-ইরান বা অন্য দেশগুলোকে বিশ্বাস না করা যায় তাহলে রাশিয়া, ইসরাঈল, আমেরিকার মতো দেশগুলোকে কেন বিশ্বাস করতে হবে? বাস্তবতা হলো, পারমাণবিক অস্ত্র কারোর কাছে নিরাপদ নয়। পারমাণবিক অস্ত্র নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বিতর্কিত একটি অস্ত্র।

ব্রিটেনের কাছ থেকে ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশটি এত ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের মুখে এর আগে কখনও পড়েনি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশও শ্রীলংকার মতো ব্যয়বহুল কিন্তু সম্পূর্ণ অলাভজনক প্রকল্পে বিদেশী ঋণ নিয়েছে, যাকে সমালোচকরা 'শ্বেত-হস্তী' প্রকল্প বলে থাকেন। শ্রীলংকার কিছু লক্ষণ ধীরে ধীরে বাংলাদেশে প্রকট হচ্ছে। আমরা চাই না আমাদের দেশ শ্রীলংকার মতো হোক, তবে বাস্তবতা কি আমরা এড়াতে পারব?

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন!

## 'যিলহজ্জ মাসের আমল' প্রবন্ধটির বাকী অংশ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ النَّحْرِ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوْا يَوْمُ النَّحْرِ. قَالَ هٰذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْاَ كْبَرِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরবানীর দিন জিজ্ঞেস করেন, এটা কোন দিন? ছাহাবীগণ উত্তরে বলেন, এটা ইয়াওমুন নাহার বা কুরবানীর দিন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, এটা হলো ইয়াওমুল হাজ্জিল আকবার বা শ্রেষ্ঠ হজ্জের দিন *(আবূ দাঊদ, হা/১৯৪৭)*। বারা ইবনু আযেব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِيْ يَوْمِنَا هَذَا اَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَاِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِاَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِيْ شَيْءٍ 'এ দিনটি আমরা শুরু করব ছালাত দিয়ে। এরপর ছালাত থেকে ফিরে আমরা কুরবানী করব। যে এমন আমল করবে সে আমাদের আদর্শ সঠিকভাবে অনুসরণ করেছে। আর যে এর পূর্বে যবেহ করে, সে তার পরিবারবর্গের জন্য গোশতের ব্যবস্থা করবে। তাতে কুরবানীর কিছু আদায় হলো না' *(ছহীহ বুখারী, হা/৯৬৫)*।

**৮. আইয়ামে তাশরীক্বের দিনে ছিয়াম না রাখা :**

ঈদুল আযহার পরবর্তী তিন দিন তথা ১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ্জ তারিখকে আইয়ামে তাশরীক্বের দিন বলা হয়। এই দিনগুলোতে ছিয়াম রাখা নিষেধ। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا فَقَالَ كُلْ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمْرٌو كُلْ فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا قَالَ مَالِكٌ وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

উম্মে হানী (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর মুক্ত দাস আবূ মুররাহ (রাহিমাহুল্লাহ) সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আমরের সাথে তার পিতা আমর ইবনুল আছ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর নিকট যান। তিনি তাদের উভয়ের সামনে খাবার এনে তা খেতে বললেন। আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, আমি ছওমরত আছি। আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ দিনগুলোতে আমাদেরকে ছওম ভাঙার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ছওম রাখতে নিষেধ করেছেন। মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তা হলো আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলো *(আবূ দাঊদ, হা/২৪১৮, সনদ ছহীহ)*। অপর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ 'আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলো হচ্ছে আমাদের মুসলিমদের ঈদের দিন, এগুলো পানাহারের দিন' *(আবূ দাঊদ, হা/২৪১৯ সনদ ছহীহ)*।

মহান আল্লাহ আমাদের এ দিনগুলোতে বেশি বেশি করে নেকীর কাজ করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

# ত্যাগের দীক্ষা দিতে কুরবানী এলো আজ ঘরে ঘরে...

-জাবির হোসেন*

## [ক]

হে মুসলিম! স্মরণ করো, আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের কথা। ইরাকের ব্যাবিলন শহরের একটি জনপদের নাম ছিল উর। যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। সেই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, যিনি ছিলেন মহান আল্লাহর প্রেরিত একজন সম্মানিত নবী। নবী হবার পর থেকে যিনি আমৃত্যু পরীক্ষা দিয়েই জীবনযাপন করেছেন। পরীক্ষার পর পরীক্ষা দিয়ে যিনি সফলতার উচ্চ শিখরে উন্নীত হয়েছেন।

স্মরণ করো, নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর কথা। যখন তাঁর সন্তান না হওয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছিলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সৎ সন্তান দান করুন' *(আছ-ছাফফাত, ৩৭/১০০)*। মহান আল্লাহ তাঁর ফরিয়াদ কবুল করেছিলেন, অতঃপর তাকে এক অতি ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, যার নাম ইসমাঈল আলাইহিস সালাম।

স্মরণ করো, সেই সময়ের কথা, যখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর শিশুপুত্র ইসমাঈল ও তাঁর স্ত্রী হাজেরা আলাইহিমাস সালাম-কে মক্কার এক বিজন পাহাড়ের উপত্যকায় রেখে আসার ইলাহী নির্দেশ পান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে; যা ছিল একটি অত্যন্ত মর্মান্তিক পরীক্ষা। এই পরীক্ষা শেষ হতে না হতেই, তিনি আরও একটি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। যে পরীক্ষা বাস্তবিকই ছিল কঠিন। এবারের পরীক্ষা, তার বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র আদরের সন্তান ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-কে কুরবানী করা।

স্মরণ করো, যখন ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর বয়স ১৩ বছর, তিনি দৌড়ঝাঁপ করতে পারেন; এসময় ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কে স্বপ্নে হুকুম দেওয়া হলো যে, তুমি তোমার কলিজার টুকরো সন্তানকে আল্লাহর রাহে কুরবানী করো।

যুলহিজ্জা মাসের অষ্টম তারিখের রাতে তিনি সর্বপ্রথম স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে নিজ হাতে যবেহ করছেন। স্বপ্নটি দেখার পরে ওই দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি এই চিন্তায় বিভোর থাকেন যে, এটি আল্লাহর তরফ থেকে সুস্বপ্ন, না-কি দুঃস্বপ্ন। অতঃপর যুলহিজ্জা মাসের নবম তারিখের রাতে তিনি আবার একই স্বপ্ন দেখেন। ফলে এই দিন তিনি জানতে ও বুঝতে পারেন যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যিকার স্বপ্ন। তারপর যুলহিজ্জা মাসের দশম তারিখের রাতে তিনি পুনরায় একই স্বপ্ন দেখেন। তাই ওই দিনে তিনি কুরবানী করতে উদ্যত হন। পরপর তিন রাত স্বপ্ন দেখার পর তার মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত তিনটি দিন তিনটি বিশেষ নামে বিশেষিত হয়েছে। যেমন : যুলহিজ্জার অষ্টম দিনের নাম 'ইয়াওমুত তারবিয়াহ' বা চিন্তাভাবনার দিন। নবম দিনের নাম 'ইয়াওমুল আরাফা' বা জানার দিন। আর দশম দিনের নাম 'ইয়াওমুন নাহর' বা কুরবানীর দিন।[১]

স্মরণ করো, সেই দিনটি, যেদিন স্বপ্ন দেখার পরে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর পুত্রকে কুরবানী দেওয়ার জন্য তৈরি হলেন। আর পিতা-পুত্র ঘর থেকে বের হয়ে গন্তব্য স্থানের দিকে রওনা দিলেন। পথিমধ্যে শয়তান তাঁদেরকে প্রতারিত করার জন্য বারবার চেষ্টা করছিল। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পরপর সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করে শয়তানকে বিতারিত করেন। সেই স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য এবং মুমিনদেরকে শয়তানের প্রতারণার বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এ বিষয়টিকে পবিত্র হজ্জের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার জন্য আজও উম্মাতে মুহাম্মাদী হজ্জের সময় তিন জামরায় তিনবার শয়তানের বিরুদ্ধে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করে থাকে।

অতঃপর, পিতা-পুত্র আল্লাহর নির্দেশিত কুরবানগাহ 'মিনায়' উপস্থিত হলেন এবং সেখানে পৌঁছে তাঁর স্বপ্নের কথা ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-কে বর্ণনা করলেন, 'হে আমার বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি, এখন বলো, তোমার অভিমত কী?' *(আছ-ছাফফাত, ৩৭/১০২)*। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম জবাব দেন, 'হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন, আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন' *(আছ-ছাফফাত, ৩৭/১০২)*। তারপর যখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালাম উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করলেন এবং ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-কে অধোমুখে শায়িত করে, তাঁর পিতা যবেহ করার জন্য উদ্যত হলেন, তখন মহান আল্লাহ ডাক দিয়ে বললেন, 'হে ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্ন বাস্তবেই পালন করলে। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা' *(আছ-ছাফফাত, ৩৭/১০-১০৬)*। অতঃপর মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'আমি এক মহাকুরবানীর মাধ্যমে তাকে মুক্ত করলাম এবং যারা এর পরে আসবে তাদের জন্য এটি স্মরণীয় করে রাখলাম। ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এভাবে আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্যতম' *(আছ-ছাফফাত, ৩৭/১০৭-১১১)*।

---

* এম. এ. (বাংলা), কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

১. শায়খ আইনুল বারী আলিয়াভী রহিমাহুল্লাহ, ঈদুল আযহা ও কুরবানী, পৃ. ১৯।

বর্তমানে উক্ত মিনা প্রান্তরেই হাজীগণ কুরবানী করে থাকেন এবং বিশ্ব মুসলিম ঐ সুন্নাত অনুসরণে ১০ই যুলহিজ্জা বিশ্বব্যাপী শরীআত নির্ধারিত পশু কুরবানী করে থাকেন।[২]

[খ]

মহান আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী সেই তখন থেকে চলে আসছে এই ইবরাহীমী আদর্শের বাস্তবায়ন। আমাদের জন্য বাৎসরিক যে দুটি ঈদ নির্ধারিত হয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো— ঈদুল আযহা। এই দিনকে আমরা 'কুরবানীর ঈদ'ও বলে থাকি। এই দিনে আমরা ঈদগাহে গিয়ে দুই রাকআত ছালাত সম্পাদনের পরে, শরীআত অনুমোদিত হালাল পশু কুরবানী করে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত ঘটনাকে স্মরণ করে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে প্রয়াসী হই। মুসলিম জনসমাজে ছালাত, যাকাত ও হজ্জসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফরয ও সুন্নাত বিষয়সমূহ উপেক্ষিত অবহেলিত পরিলক্ষিত হলেও কুরবানীর মতো ইবাদত ধুমধামের সহিত উদযাপিত হয়ে থাকে।

কুরবানী নিছক কোনো আনন্দানুষ্ঠান নয় যে, তা সাড়ম্বরে পালন করে আনন্দ-উল্লাস, হৈ-হুল্লোড় ও খেল-তামাশার মধ্য দিয়ে দিনটিকে পার করা হবে। বরং কুরবানী হলো একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কুরবানী ইসলামের একটি 'মহান নিদর্শন'। ইসলামের মৌলিক নিদর্শনসমূহের অন্যতম এটি। যা সুন্নাতে ইবরাহীমী হিসাবে আল্লাহর কিতাব, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মাত দ্বারা সাব্যস্ত। আর ইবাদতে যদি বিন্দুমাত্র লৌকিকতা প্রদর্শনের ইচ্ছা থাকে তাহলে তা মহান আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না। উল্লেখ্য, ফরয বা নফল যে কোনো ইবাদত মহান আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে। আর তা হলো :

**(১) বিশুদ্ধ ঈমান :** শিরক, কুফর ও নিফাকমুক্ত তাওহীদ ও রিসালাতের বিশুদ্ধ ঈমান সকল ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত।

**(২) ইবাদতের ইখলাছ :** ইখলাছ অর্থ বিশুদ্ধকরণ। ইবাদতটি একান্তই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টি বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যের সামান্যতম সংমিশ্রণ থাকলে সে ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন না।

**(৩) অনুসরণের ইখলাছ :** কর্মটি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণে পালিত হতে হবে। সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্ম ইবাদত বলে গণ্য নয়।

**(৪) হালাল ভক্ষণ :** ইবাদত পালনকারীকে অবশ্যই হালাল জীবিকানির্ভর হতে হবে। হারাম ভক্ষণকারীর কোনো ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।[৩]

[গ]

কুরবানী হলো ইসলামের ইতিহাসে এক অতুলনীয় বিরল ঘটনা। এটি ইবরাহীম, ইসমাঈল ও মা হাজেরা আলাইহিস সালাম-এর পরম ত্যাগের স্মৃতিবিজড়িত ইবাদত। এই ইবাদতটির ইতিহাস রচনার পেছনে পিতা-পুত্র ও মায়ের ভূমিকা ছিল অসামান্য। তাঁদের মধ্যে ছিল বিশ্বাসের সেতুবন্ধন এবং মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা। আদর্শ মানব যেমন— সর্বদা আল্লাহর আদেশ সন্দেহাতীতভাবে মেনে চলে, তারই প্র্যাকটিক্যাল দৃষ্টান্ত রয়েছে তাঁদের পরম আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের মধ্যে। তাঁরা ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা স্থাপনকারী, যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। কবি নজরুল ইসলামের ভাষায়—

'ডুবে ইসলাম, আসে আঁধার!
ইবরাহিমের মতো আবার
কোরবানি দাও প্রেয় বিভব!
'জবিহুল্লাহ' ছেলেরা হোক,
যাক সব কিছু-সত্য রোক!
মা হাজেরা হোক মায়েরা সব।'

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন কী উদ্দেশ্যে কুরবানী করার হুকুম প্রদান করেছেন অথবা কুরবানী থেকে কী শিক্ষা অর্জন করতে বলেছেন, এই বিষয়গুলো আজ উপেক্ষিত। আমাদের এই ইবাদতটি মহান আল্লাহ কবুল করছেন কিনা, সেই দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজনও মনে করি না। অথচ ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত রয়েছে, যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এখন আমরা দেখব, ইবাদত কবুলের পূর্বশর্তের কষ্টিপাথরে যাচাই করে যে, আমাদের এই কুরবানী নামক ইবাদতটি মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হচ্ছে কিনা।

ইবাদত কবুলের প্রথম শর্ত হলো— বিশুদ্ধ ঈমান। আমরা যারা কুরবানী দিই আমাদের ঈমান আছে বলেই তো দিই। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ইবাদত কবুলের দ্বিতীয় শর্ত হলো— ইবাদতের ইখলাছ। অর্থাৎ ইবাদতটি একান্তই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। এই শর্তটি আমাদের অনেকেরই লঙ্ঘিত হয়। আমাদের অনেকেরই কুরবানীর ইবাদতে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি গৌণ হলেও, মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় লৌকিকতা এবং সামাজিকতা। লৌকিকতা ও সামাজিকতার বাস্তব উদাহরণ আমরা সমাজে দেখতে পাই 'কুরবানী না দিলে লোকে বলবে কী, কে কত বেশি মূল্যে পশু ক্রয় করল— তা নিয়ে আত্মতুষ্টি, কার কত বেশি গোশত হলো, কে ঠকলো আর কে জিতল' ইত্যাদি বাক্যগুলোর মাধ্যমে।

২. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নবীদের কাহিনী-১ম খণ্ড, 'হযরত ইবরাহীম (আ.)' অধ্যায় দ্রষ্টব্য (রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) ।

৩. ডঃ খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমাহুল্লাহ, রাহে বেলায়াত, (আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স), পৃ. ২৬২-২৬৩।

ইবাদত কবুলের তৃতীয় শর্ত হলো— অনুসরণের ইখলাছ। এই শর্তটি আমরা মেনে চলি। আমরা শরীআত সমর্থিত পশু ক্রয় করি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তা যবেহ করি। ইবাদত কবুলের চতুর্থ শর্ত হলো— হালাল ভক্ষণ। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হালাল ভক্ষণের আদেশ ও হারাম ভক্ষণের নিষেধ থাকলেও এই শর্তটি আমাদের অনেকেরই লঙ্ঘিত হয়। আমরা অনেকেই মিথ্যা, ধোঁকা, প্রতারণা, সূদ, ঘুষ, জুয়া ও জালিয়াতি অথবা সরাসরি হারাম পেশার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থেকে উপার্জন করি। তারপরও আমরা কুরবানী দিই। এখন আমাদের ভেবে দেখা উচিত, আমরা যারা হারাম উপার্জনের সঙ্গে যুক্ত থেকে কুরবানী দিচ্ছি, তা কী মহান আল্লাহর নিকট গৃহীত হচ্ছে?

সবমিলিয়ে বলা চলে, ইবাদত কবুলের পূর্বশর্তের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম ও তৃতীয় শর্ত লঙ্ঘিত না হলেও দ্বিতীয় ও চতুর্থ শর্তটি লঙ্ঘন করছেন অনেক কুরবানীদাতা। এক্ষণে এই কুরবানীদাতাদের জন্য ভেবে দেখার অনুরোধ রইল, আপনার কুরবানী সত্যিই কি মহান আল্লাহ কবুল করছেন, না-কি শুধু গোশত ভক্ষণই হচ্ছে?

**[ঘ]**

এক্ষণে প্রশ্ন আসতে পারে, কার কুরবানী গৃহীত হবে? উত্তরে বলা যায়, উপরিউক্ত ইবাদত কবুলের পূর্বশর্তগুলো পরিপূরণকারী বান্দা আশা করতে পারেন যে, আপনার কুরবানী মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হচ্ছে। আর অন্যরা, আপনারা হাবীল ও কাবীলের ঘটনাটি স্মরণ করতে পারেন। কুরবানী দিলেই যে তা গৃহীত হবে, তার নিশ্চয়তা নেই। কেননা আদম আলাইহিস সালাম-এর দুই ছেলের কুরবানী পেশ করার কথা কুরআন থেকে আমরা জানতে পারি। মহান আল্লাহ বলেন, 'আদমের দুই পুত্রের (হাবীল ও কাবীলের) বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে শোনাও, যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল, তখন একজনের কুরবানী কবুল হলো এবং অন্যজনের কুরবানী কবুল হলো না। (তাদের একজন) বলল, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব। (অপরজন) বলল, আল্লাহ তো সংযমীদের কুরবানীই কবুল করে থাকেন' *(আল-মায়েদা, ৫/২৭)*।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে বলা হয়েছে— 'এখানে হাবীল ও কাবীলের কথোপকথনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে যে, সৎকর্ম ও ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহভীতির উপর নির্ভরশীল। যার মধ্যে আল্লাহভীতি নেই, তার সৎকর্মও গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণেই পূর্ববর্তী আলেমরা বলেছেন, আলোচ্য আয়াত ইবাদতকারী ও সহকর্মীদের জন্য চাবুকস্বরূপ। এজন্যই আমের ইবনু আব্দুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ অন্তিম মুহূর্তে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। উপস্থিত লোকেরা বলল, আপনি তো সারা জীবন সৎকর্ম ও ইবাদতে মশগূল ছিলেন। এখন কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, তোমরা একথা বলছ, আর আমার কানে আল্লাহ তাআলার এ বাক্য প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ 'আমার কোনো ইবাদত গৃহীত হবে কিনা তা আমার জানা নেই' *(আল-মায়েদা, ৫/২৭)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'যদি আমি নিশ্চিতরূপে জানতে পারি যে, আল্লাহ তাআলা আমার কোনো সৎকর্ম গ্রহণ করেছেন, তবে এটা হবে আমার জন্য একটি বিরাট নেয়ামত। এ নেয়ামতের বিনিময়ে সমগ্র পৃথিবী স্বর্ণে পরিণত হয়ে আমার অধিকারে এসে গেলেও আমি তাকে কিছুই মনে করব না'। আবূদ্দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'যদি নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, আমার একটি ছালাত আল্লাহর কাছে কবুল হয়েছে, তবে আমার জন্য এটি হবে সমগ্র বিশ্ব ও তার অগণিত নেয়ামতের চাইতেও উত্তম'। উমার ইবনু আব্দুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ কোনো এক ব্যক্তিকে পত্র মারফত নিম্নোক্ত উপদেশাবলি প্রেরণ করেন— আমি জোর দিয়ে বলছি যে, তুমি আল্লাহভীতি অবলম্বন করো। এছাড়া কোনো সৎকর্ম গৃহীত হয় না। আল্লাহভীরু ছাড়া কারও প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হয় না, এবং এটি ছাড়া কোনো কিছুর ছওয়াবও পাওয়া যায় না। এ বিষয়ের উপদেশদাতা অনেক, কিন্তু একে কার্যে পরিণত করে— এরূপ লোকের সংখ্যা নগণ্য। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহভীতির সাথে ছোট সৎকর্মও ছোট নয়। যে সৎকর্ম গৃহীত হয়ে যায় তাকে কেমন করে ছোট বলা যায়'।[৪]

**[ঙ]**

পশু কুরবানীর মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহ কোন বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন? পশু কুরবানী দিয়ে আমাদের লাভ কী? শুধুই কী গোশত খাওয়া, না-কি অন্য কিছু? এ বিষয়ের দিকে আমরা গুরুত্ব দিতে চাই না। কুরবানীর যে মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে, তা সম্পর্কে আমরা অসচেতন। আর কুরবানী থেকে আমাদের যে শিক্ষা লাভ করতে হবে, সে ব্যাপারে আমরা বেখেয়াল। অথচ কুরবানীর মতো ইবাদত মহৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ। এতে আছে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। আর তা হলো :

**(১) সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্যের শিক্ষা :** কুরবানীর অন্যতম শিক্ষা হলো, মহান আল্লাহর আনুগত্য; যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। তিনি তাঁর সন্তানের প্রতি স্নেহ, দয়া, মায়া ও ভালোবাসা এবং স্ত্রীর প্রতি মুহাব্বত থেকে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহ তাআলার আদেশকে কার্যকর করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। মহান আল্লাহর আদেশটি কঠিন না

৪. মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহিমাহুল্লাহ, তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, সূরা আল-মায়েদা, ৫/২৭-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

সহজ, তা ভেবে দেখেননি। 'এটি মহান আল্লাহর হুকুম এবং আমি তাঁর দাস, আমার কর্তব্য হুকুমটি মান্য করা' এই আদর্শ, এই মন-মানসিকতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কে সফলতার উচ্চ শিখরে নিয়ে গেছে। মহান আল্লাহর প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল শর্তহীন— তা সুস্পষ্ট। এখান থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাআলার যে কোনো আদেশ, তা সহজ হোক বা কঠিন, তা পালন করার বিষয়ে আমাদেরও মন-মানসিকতা থাকতে হবে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর মতো। দুনিয়াবী স্বার্থকে অগ্রাধিকার না দিয়ে, মহান আল্লাহর আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দুনিয়ার স্বার্থকে দিতে হবে কুরবানী।

**(২) তাক্বওয়া অর্জনের শিক্ষা :** তাক্বওয়া অর্জন ব্যতীত মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় না। আমাদের জীবনের অন্যতম চাওয়া হলো, মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। কুরবানীর অন্যতম একটি শিক্ষা হলো তাক্বওয়া অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। এখন প্রশ্ন হলো, তাক্বওয়া কী? 'তাক্বওয়া' শব্দের অর্থ- আত্মরক্ষা করা। যে কর্ম বা চিন্তা করলে মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, যেসব কর্ম বা চিন্তা বর্জনের নাম তাক্বওয়া। মূলত সকল হারাম, নিষিদ্ধ ও পাপ বর্জনকে তাক্বওয়া বলা হয়।[৫]

তাক্বওয়ার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে বলা হয় মুত্তাক্বী। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, 'মহান আল্লাহ মুত্তাক্বীদের কুরবানীই কবুল করেন' *(আল-মায়েদা, ৫/২৭)*। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, 'আর আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এগুলোর গোশত এবং না এগুলো রক্ত, বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া' *(আল-হজ্জ, ২২/৩৭)*। অথচ আমরা তাক্বওয়া অর্জনকে গুরুত্ব না দিয়ে বেশি বেশি লৌকিকতা ও সামাজিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েছি। ফলস্বরূপ কুরবানী আজ আর মহৎ ইবাদত না হয়ে আমাদের কাছে নিছক একটি গোশত খাওয়ার আনন্দানুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। উপেক্ষিত হয়েছে— ইবরাহিমী চেতনা, ইসমাঈলের আত্মত্যাগ ও মা হাজেরার ধৈর্য।

**(৩) ভোগে নয়, ত্যাগেই সফলতার শিক্ষা :** কুরবানীর আরও একটি অন্যতম শিক্ষা হলো— ত্যাগের মানসিকতা গড়ে তোলা। মহান আল্লাহর বিধিবিধান পালনে আমাদেরকে ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে। নিজেদের জীবনের ভেতর যে পশুসুলভ আচরণ আছে, তা ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। মূলত মানুষ এবং পশুর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। মানুষের মধ্যে আছে বিবেক ও বোধশক্তি। এই বোধশক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ ভালো ও মন্দের পার্থক্যে জ্ঞান লাভ করতে পারে; যেটা পশুর পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

৫. ডঃ খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমাহুল্লাহ, রাহে বেলায়াত, (আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স), পৃ. ৪১।

কিন্তু যখন মানুষের বিবেক দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন ভালো-মন্দের বিচার করার ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পায়। ফলস্বরূপ মানুষও এক পর্যায়ে পশুর সারিতে অবস্থান করে। একথার সমর্থন পাওয়া যায় পবিত্র কুরআনে— 'তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দর্শন করে না। তাদের কর্ণ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শ্রবণ করে না। এরা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়। বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত। তারাই হলো উদাসীন' *(আল-আ'রাফ, ৭/১৭৯)*।

সুতরাং কুরবানীর অন্যতম শিক্ষাই হলো, পশু কুরবানীর মধ্য দিয়ে নিজের প্রবৃত্তির মধ্যে যে পশুত্ব রয়েছে, সেটিকে কুরবানী দেওয়া। নিজেদের আত্ম-সংশোধন ও আত্ম-উন্নয়ন ঘটানো। তবেই কুরবানীর আসল উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। তাক্বওয়া অর্জিত হবে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। কবির ভাষায়—

'ত্যাগের দীক্ষা দিতে কুরবানী
এলো আজ ঘরে ঘরে,
এই শুভক্ষণে মনের কালিমা
দাও তুমি দূর করে।
মনের পশুকে বলি দাও তুমি,
বলি দাও হিংসার
লোভ লালসার বলি দিয়ে কভু
চলো না সে পথে আর'।[৬]

**(৪) সমাজের প্রবীণ ও নবীনদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের শিক্ষা :** পিতা ও পুত্রের বিশ্বাসগত সমন্বয় ব্যতীত কুরবানীর এই গৌরবময় ইতিহাস রচিত হতো না। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম যদি পিতার অবাধ্য হতেন এবং দৌড়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যেতেন, তাহলে আল্লাহর হুকুম পালন করা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর পক্ষে হয়তো বা আদৌ সম্ভব হতো না। তাই এ ঘটনার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সমাজের প্রবীণদের কল্যাণময় নির্দেশনা এবং নবীনদের আনুগত্য ও উদ্দীপনা একত্রিত ও সমন্বিত না হলে কখনোই কোনো উন্নত সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়।[৭]

## [চ]

মানব জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী দুটি মারাত্মক ব্যাধির নাম হলো হিংসা ও অহংকার। হিংসা ও অহংকার মানুষকে পশুর চাইতে নিচে নামিয়ে দেয়। এরই বাস্তব প্রতিফলন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে মুসলিমদের মধ্যে ভাই-ভাই, পিতা-পুত্র, মামা-ভাগ্নে, চাচা-ভাতিজা এক কথায় আত্মীয়-

৬. কিছু ব্যথা কিছু কথা (প্রথম খণ্ড), কবিতা: এল কোরবানী, মোহাঃ নুরুল ইসলাম মিয়া, পৃ. ২০।

৭. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নবীদের কাহিনী-১ম খণ্ড, (রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ), পৃ. ১৪০।

স্বজনদের মধ্যে মারামারি, খুনাখুনি, হিংসা-কলহ-বিদ্বেষ বিদ্যমান। এটি নবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর শিক্ষা নয়। কারণ তিনি বলেছেন, 'পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না'।[৮]

এই কুরবানীর মধ্য দিয়ে, আমাদের যত হিংসা-বিদ্বেষ ও অহমিকা রয়েছে, সবগুলোকে বিসর্জন দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে। হুসনুল খুলূক্ব তথা উত্তম চরিত্র, বিনয় ও নম্রতা নিজেদের জীবনে আনার চেষ্টা করতে হবে। মহান আল্লাহর বিধি-নিষেধ সম্পর্কে অবগত হতে হবে। নিজেকে সৎকাজে অভ্যস্ত করতে হবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লোভ-লালসা কমানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কবির ভাষায়—

'বলি দাও তুমি হৃদয়ের মাঝে
যত শয়তানী আশা,
মনের ভেতরে সঞ্চিত রেখো
প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা।
আল্লাহকে পেতে ছুটে এসো তুমি
ত্যাগের দীক্ষা নিতে,
এসো এসো আজ যত ভালোবাসা
উজাড় করিয়া দিতে'।[৯]

তাই আসুন! কুরবানীর উৎসব যেন আমাদের কাছে নিছকই কোনো গোশত খাওয়ার উৎসবে পরিণত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখি। কুরবানীর মতো মহৎ ইবাদতে কোনো অন্তর্নিহিত শিক্ষাগুলো লুক্কায়িত আছে, সেগুলো সন্ধান করে বাস্তবে প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হই। তাহলে সমাজে ভাতৃত্ববোধ, সৌহার্দ, সম্প্রীতি, হৃদ্যতাপূর্ণ, বন্ধুত্বসুলভ অনুপম সম্পর্ক গড়ে উঠবে। আমরা সকলে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলার সাথে বসবাস লাভে ধন্য হব ইনশাআল্লাহ।

প্রখ্যাত উর্দূ কবি আল্লামা ইকবাল যথার্থই বলেছেন, 'যদি আমাদের মাঝে ফের ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -এর ঈমান পয়দা হয়, তাহলে অগ্নির মাঝে ফের ফুলবাগানের নমুনা সৃষ্টি হতে পারে'।

৮. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৮৪।

৯. 'কিছু ব্যথা কিছু কথা' (প্রথম খন্ড) কবিতা: এলো কোরবানী, মোহাঃ নুরুল ইসলাম মিয়া, পৃ.২০।

## 'ঈমান ভঙ্গের কারণ' প্রবন্ধটির বাকী অংশ

**(১১) ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম তালাশ করা :**

কেউ যদি আল্লাহর দ্বীন ইসলামকে ছেড়ে অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, তাদেরও ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মকে গ্রহণ করবে, তার কোনো আমল গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান, ৩/৮৫)*।

অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম ছাড়া আর কোনো ধর্মই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম কেউ পালন করলে তাকে অবশ্যই জাহান্নামের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

**(১২) দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া :**

কেউ যদি দ্বীন ইসলামের বিধিবিধান বা আমলসমূহকে বোঝা মনে করে তা থেকে বিরত থাকে তাহলে তার ঈমান থাকবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তার চেয়ে বড় যালেম আর কে, যাকে স্বীয় রবের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়ার পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিশ্চয় আমি অপরাধীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী' *(আস-সাজদাহ, ৩২/২২)*।

অর্থাৎ যেসব ঈমানদারের আল্লাহর বিভিন্ন বিষয়ের উপর ঈমান এবং আমল করতে বলা হয়, তখন তারা দ্বীনের হুকুম-আহকামকে বোঝা মনে করে এবং তারা দ্বীনের বিভিন্ন বিধিনিষেধ এবং আমল থেকে নিজেদের গুটিয়ে রাখে। এসব ব্যক্তির ঈমান আর অবশিষ্ট থাকে না। আল্লাহ বলেন, 'আমার স্মরণ (ঈমান, আমল, যিকির) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ (কষ্টে পতিত) হবে এবং আমি তাকে ক্বিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? আমিতো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ বলবেন, এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল। অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে' *(ত্বা-হা, ২০/১২৪-১২৬)*।

অতএব, দ্বীন ইসলাম থেকে কেউ যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তার ঈমান বিনষ্ট হবে। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী আক্বীদা ও তাওহীদ গ্রহণের পর যদি কেউ উপরোল্লিখিত বিষয়গুলোতে নিপতিত হয়, তবে সে ঈমানহারা হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে হিফাযত করুন।

# প্রিয় ভাই! প্রিয় শিক্ষক!

*-মাযহারুল ইসলাম আবির**

একদিন যায়, দুইদিন যায়, এভাবেই কেটে গেল বেশ কিছু দিন। গত কয়েকদিনের ন্যায় জ্ঞানপিপাসুদের জ্ঞানের খোরাক মেটাতে আজও উপস্থিত নেই নিত্যপ্রিয় মুখাবয়ব। এক অজানা অভাব যেন প্রতিনিয়ত বিচরণ করছে মানসজগতে। চেহারায় আনন্দের ছাপ ভেসে উঠলেও, কেন জানি চিত্তপট তার আনন্দের রেখা প্রকাশ করতে ভীষণ নারাজ।

কেন এই বিরহব্যথা? হয়তো আবেগী এ মন হাতড়ে বেড়াচ্ছে অনির্বচনীয় কিছু স্মৃতি। হাতড়াচ্ছে অতীতের কিছু গল্প। যেই স্মৃতির মাঝে লুক্কায়িত এক চিলতে প্রশান্তি। যেই গল্পের প্রধান চরিত্র এমন এক সূর্য, যে মেঘে ঢাকা অন্তরের পাশে দাঁড়িয়ে আশার আলো দেখিয়ে বলেছিল, 'কী হয়েছে, ভাই! কোনো সমস্যা?'

ইনি তো সেই ভাই, যার কাছেই আমরা শেয়ার করতাম কিছু অভাবের কথা, কিছু সুখ আর ব্যথা। আর তিনি তাঁর সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দিয়ে ভুলিয়ে দিতেন সকল অভাব। যখন বুঝতাম না কোনো নিয়ম, সবকিছু ছিল এলোমেলো, অগোছালো ছিল শিখন পদ্ধতি, তখন তিনি কাঁধের উপর হাত রেখে বলেছিলেন, 'নিজের লক্ষ্যকে ফোকাস করো, যেই বিষয়ে পারদর্শী তা আঁকড়ে ধরো। একাডেমিক শিক্ষার মাঝে সীমাবদ্ধ থেকো না, নিজ আগ্রহে অগ্রসর হও'।

সৃজনশীলতার শিক্ষা তো তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। কাঙ্ক্ষিত এবং অযাচিত সময়ে তিনি ছিলেন অনুপ্রেরণার ঝুলি। মুখাবয়বের মৌনাবলম্বন এবং সুখানুভূতির ছাপ দেখে বুঝে নিতেন একবুক সমুদ্রের না বলা ভাষা। বৃষ্টিভেজা ফুলের পাপড়ির মতো নরম-কোমল অন্তরের মানুষটি যেন পরের সামান্য ব্যথাতেই ভেঙে পড়তেন।

ভাইটা তো এমন নৌকার মাঝি, জ্ঞান অর্জনের জন্য অবিরাম যেই নৌকার দ্বার আমাদের জন্য উন্মুক্ত।

মন খারাপের দিনে তিনি এমন, যেন মেঘের কোলে এক খণ্ড রোদ।

অসুস্থ ছাত্রের পাশে তিনিই স্নেহ ও মায়ার একরাশ বৃষ্টি।

ছাত্রদের দুঃখকষ্টে সমান ভাগীদার হওয়া যেন তার রক্তে মাংসে মিশে আছে।

মসজিদে যেন ছাত্রদের পড়ার সঙ্গী, গল্পে যেন খুব কাছের বন্ধু, দারসে যেন গুরুগম্ভীর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এক আদর্শ শিক্ষক।

কে এই তিনি? মনটা ব্যাকুল হয়ে জানতে চাচ্ছে, তাই না? আরে তিনিই তো আমাদের প্রিয়, সবার প্রিয় এক নাম আব্দুর রহমান ভাই।

কঠিন পরিস্থিতি হয়তো তাঁর আর আমাদের গল্পের মোড়টাকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু হৃদয়ের বাঁধনটা ঠিকই আছে। অবিরাম চলন্ত তার সাথে থাকার অদম্য অভিলাষ। প্রিয়তম ভাইটা আজকে চোখের অগোচরে থাকা সত্ত্বেও কেন জানি তাঁর হাসিমাখা মুখটা বারবার ভেসে উঠছে চিত্তপটে। যেন তিনি দূরে থেকেও কাছে। তাই তো তাঁর জন্য প্রতিনিয়ত, 'তুলি দুই হাত করি মুনাজাত'।

পরিশেষে দুঃখভারাক্রান্ত মনে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই— 'জীবনের কঠিন ও দুর্বিষহ সময়গুলোকে ভালোবাসতে শিখুন; ভরসা রাখুন শুধু রবের উপর'।

**'যে জ্ঞানার্জনের পথে চলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন'**

(ছহীহ মুসলিম হা/২৬৯৯; আবূ দাঊদ হা/৩৬৪১)

* নবম শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী।

# কুরবানী

*-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী**

‘এই নে খা, খা-না লালী! দেখ তোর জন্য কত ঘাস আনছি’। এই অনুরোধটুকু সাকিবের, উদ্দেশ্য তার প্রিয় ছাগল লালী। সাকিব সিরাজ উদ্দীনের নিম্নবিত্ত পরিবারের ছোট ছেলে। সে ক্লাস ফোরে পড়ে।

সিরাজ স্থানীয় এক দানশীল ব্যক্তি থেকে ক্বর্যে হাসানার মাধ্যমে কিছু ঋণ নিয়ে এই কুরবানী ঈদে বিক্রি করার জন্য বেশ কয়েকটি ছাগল কিনেছে। লালী সেই ছাগলগুলোর একটি। যাকে সাকিব প্রথম দিন থেকেই খুবই পছন্দ করেছে।

লালীকে পাওয়ার পর থেকে ও নাওয়াখাওয়াই ভুলে গেছে। সাকিবের এমন ছাগলপ্রীতি দেখে ওর বন্ধুরা সবাই হাসিঠাট্টা করে। বিশেষ করে সাব্বির। সাব্বিরকে এমনিতেই সাকিব পছন্দ করে না। কেননা ও একটু গুন্ডা টাইপের ছেলে।

সাব্বিরের সাথে ঝগড়া নেই এমন ছেলে-মেয়ে স্কুলে পাওয়া দুষ্কর। ও কাউকে মেনে চলে না, এমনকি স্কুলের শিক্ষকদেরও নয়। তার কারণ সে খুবই বড় লোকের ছেলে। তার বাবা স্কুলের সভাপতি, আর স্কুলটাও সাব্বিরের দাদার নামে। আর তাই হেন খারাপ কাজ নেই যা সে করে না। সাব্বিরের হাত থেকে বাঁচার জন্য সবাই ওকে এড়িয়ে চলে। তবুও সে গায়ে পড়েই ঝগড়া করতে এগিয়ে যায় সবসময়।

আজও যখন দেখল সাকিব তার প্রিয় ছাগল লালীর সাথে খেলছে, তখনই সাব্বিরের মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি চাপল। সে শুধু শুধুই লালীকে দৌড়াতে লাগালো। হঠাৎ এমন আক্রমণ দেখে লালীও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দৌড়াতে শুরু করল। সাকিব কিছুতেই লালীকে আটকে রাখতে পারল না।

সাকিবের এমন অসহায় অবস্থা দেখে সাব্বির হেসে কুটিকুটি। সেই সাথে তার সাঙ্গোপাঙ্গরাও সাকিবকে বিশ্রীভাবে উপহাস করে বলতে লাগল— ‘হি হি ছাগল পালে পাগলে, সাকিবের ছাগল গেল চলে’। এভাবে সবাই চিৎকার করে উল্লাস করতে লাগল। সাকিবের চেহারা প্রায় কাঁদো কাঁদো। সে সবার অপমান সহ্য করে চুপ মেরে রইল। সে ভালো করেই জানে এদের সাথে ঝগড়া করে লাভ নেই। তার চেয়ে তার লালীর কাছে যাওয়াই উত্তম। সাকিবের এমন লেজ গুটিয়ে পালানোর দৃশ্য সাব্বিরদের খুবই উৎসাহ যোগাল। তারা নিজেদের কৃতকর্মে বেশ গর্ববোধ করতে লাগল।

ঘটনাটা এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু সাব্বির এই ঘটনার রেশ স্কুল পর্যন্ত নিয়ে গেল। পরদিন সাব্বির স্কুলে গিয়ে রটিয়ে দিল ‘ছাগল পালে পাগলে, সাকিব তুমি কোথায় গেলে’। এমন চূড়ান্ত অপমানও সাকিব বেশ ধৈর্যের সাথে হজম করল।

এভাবে অপমান সহ্য করার পরও সাকিব তার লালীর নাগাল ছাড়ল না। কুরবানীর বাজারে সাকিবদের বেশ কয়েকটি ছাগল বিক্রি হয়ে গেল। সাকিবের বাবা বেশ কয়েকবার লালীকে হাটে নিতে চাইলেও সাকিবের বাধার মুখে নিয়ে যেতে পারেনি।

এক শুক্রবার জুমআর খুৎবায় খত্বীব সাহেব কুরবানীর কাহিনী ওয়াজ করলেন। সেই ওয়াজে সাকিব যখন শুনল আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রিয় জিনিসকেই কুরবানী হিসেবে কবুল করেন। যে যার যত প্রিয় পশু কুরবানী করবে সে তত বেশি ছওয়াবের ভাগিদার হবে। সেদিন ঘরে ফিরেই সাকিব তার বাবাকে তার মনের কথা জানাল।

কিন্তু তার বাবা কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না লালীকে কুরবানী দিতে। কেননা তাদের সেই সামর্থ্য নেই কুরবানী করার। কিন্তু কে শুনে কার কথা। সাকিব তো নাছোড়বান্দা। বেশ কয়েকজন খরিদ্দার এসে ফেরত গেছে, সাকিব কিছুতেই লালীকে বিক্রি করতে রাজি নয়। কেননা সে লালীকে ভালোবেসে ফেলেছে। আর ভালোবাসার জিনিসই কুরবানী দিতে হয়। শেষ পর্যন্ত সাকিবের মা’র কথা শুনে তার বাবা রাজি হয়।

এদিকে সাব্বিরের কানে যখন সাকিবের কথা গেল, তখন সে হেসেই লুটোপুটি। কেননা গ্রামে তারাই সবসময় বড় গরু দিয়ে কুরবানী করে। তাই যখন গরীবের ছেলে সাকিব ছাগল দিয়ে কুরবানী করবে শুনল তখন তো তার হাসি পাওয়ারই কথা। সে সাথে সাথেই তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে চলে গেল সাকিবের কাছে। তাকে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করল রাগিয়ে দিতে ।

কিন্তু শান্ত ছেলে সাকিব কিছুতেই সে পথে পা বাড়ালো না। শেষ পর্যন্ত সাব্বির নিজে নিজেই বড়াই করে বলতে

* পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

লাগল— ‘এই একটা পুঁচকে ছাগল দিয়ে কি কুরবানী হয়? কুরবানী করতে হয় গরু দিয়ে। এবার আমাদের সবচেয়ে বড় গরু দিয়ে কুরবানী করব’।

সাব্বিরের এইসব কথা শুনেও না শুনার ভান করে ওকে এড়িয়ে যেতে চাইল সাকিব। কিন্তু সাব্বির নাছোড়বান্দা, সে যে করেই হোক সাকিবের সাথে ঝগড়া করবেই। যখন সাব্বির অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি করতে লাগল, তখন সাকিব একটি কথাই বলল— ‘বড় গরু যবেহ করলেই কুরবানী কবুল হয় না, কুরবানী দিতে হয় প্রিয় জিনিস’। এটা বলেই সাকিব লালীকে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু সাব্বির চলে গেল না। সে ভাবতে লাগল কথাটা। শেষে ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, এবার হাটে সবচেয়ে বড় এবং দামী গরুটা তারাই কিনবে।

যে ভাবা সেই কাজ। সাব্বির তার বাবাকে নিয়ে সব হাট-বাজার ঘুরে সবচেয়ে বড় এবং দামী দেখে একটা গরু কিনল। সাব্বিরের বাবাও ছেলের এমন উৎসাহ দেখে খুশী হলো। কেননা সচরাচর সাব্বির এইসব নিয়ে তেমন উৎসাহ দেখাত না। তাই ছেলের এমন আগ্রহ তাকেও বেশ আন্দোলিত করল।

সাব্বির তাদের কুরবানীর গরু নিয়ে সারা গ্রাম চষে বেড়াল। সবাইকে গরু দেখিয়ে দেখিয়ে বেশ গর্ববোধও করতে লাগল। সাকিবদের ঘরে গিয়েও সাকিবকে স্পেশালভাবে দেখিয়ে দিল যে, তাদের গরু কত বড়। এমনকি সুযোগ বুঝে গরু দিয়ে লালীকে গুঁতো দিতেও দ্বিধা করল না সাব্বির।

অবশেষে কুরবানীর পালা শেষ হলো। সাব্বির মনের আনন্দে বন্ধুবান্ধব নিয়ে কুরবানীর গরুর গোশত খেতে লাগল। অপরদিকে সাকিব কিছুতেই লালীর রান্না করা গোশত স্পর্শ করতে চাইল না। তার বাবা-মা এত করে বুঝালো তবুও সে খেল না। শুধু লালীর মায়ায় কান্না করতে লাগল। যে লালীকে নিয়ে তার সুন্দর কিছু দিন অতিবাহিত হয়েছিল, সেই আনন্দ-অশ্রুঝরা দিনগুলো শুধুই তার স্মৃতিপটে ভেসে উঠতে লাগল।

যতই লালীর কথা মনে পড়ছে ততোই সাকিব আবেগতাড়িত হয়ে নীরব অশ্রুজলে সিক্ত হতে লাগল। তার বাবা ছেলের এই অবস্থা দেখে তাকে জানালো যে, যদি সে কুরবানীর গোশত না খায়, তবে তাদের কুরবানী কখনোই আল্লাহর কাছে কবুল হবে না। বাবার এই কথা খুবই কাজ দিল এবং সাথে সাথে কান্না মুছে সবার সাথে খেতে বসল। কেননা সে আল্লাহকে খুশী করার জন্যই কুরবানী করেছে।

কুরবানীর দিন রাত্রে সাকিব বুকভাঙা লালীর কষ্ট নিয়ে ঘুমোতে গেল। অপরদিকে সাব্বির এত খেয়েছে যে, কখন ঘুমিয়ে পড়ল সে খেয়ালই তার ছিল না। ঐদিন রাত্রে সাকিব খুব সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখতে লাগল। যেখানে অপূর্ব সুন্দর সাদা চাদরে ঢাকা একজন মানুষ তাকে নিয়ে যাচ্ছে সবুজ প্রকৃতিতে ঢাকা পাহাড়ের পানে।

একসময় সেখানে দেখতে পেল তার প্রিয় লালীকে। লালীকে দেখেই সে আনন্দে আত্মহারা! লোকটি তাকে লালীর পিঠে তুলে দিল। আর লালী তাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল সুদূর দিগন্ত পানে। সেখানে হাজারো সুন্দর সুন্দর পশু-পাখি খেলা করছে। কত সুন্দর সেইসব দৃশ্য। এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

ওদিকে সাব্বিরও গভীর ঘুমে বিশ্রী বিদঘুটে একটি স্বপ্ন দেখল। স্বপ্নে কালো কাপড়ের ঢাকা একটি লোক তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের উপরে। যেখানে তাদের কুরবানীর গরুটা ক্রুদ্ধ মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। আর তাকে দেখামাত্রই তার দিক তেড়ে গেল। সে নিজেকে বাঁচানোর জন্য প্রাণপণে দৌড়াতে লাগল। তার এই অবস্থা দেখে কালো লোকটি হা হা হা করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

যখন সাব্বির প্রাণবাজি রেখে কালো গরুটির হাত থেকে বাঁচার লড়াই করছে, তখন একটি দৃশ্য দেখে সে থমকে দাঁড়াল। সে দেখতে পেল সাকিব তার প্রিয় ছাগল লালীর পিঠে বসে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর তাকে দেখামাত্রই মুচকি হাসি দিয়ে তার থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। একসময় ক্রুদ্ধ গরুটি সাব্বিরকে প্রচণ্ড একটি গুঁতো দিল। আর সাথে সাথেই তার ঘুম ভেঙে গেল। সে খুবই অস্থিরতা অনুভব করল। যখন সে স্থির হলো, তখন বুঝতে পারল আসলে কুরবানী নিয়ে সে যা করেছে তা খুবই ভুল ছিল।

পরদিন সকালে সাব্বির সাকিবের সাথে দেখা করে তার স্বপ্নের কথা জানাল এবং তার ভুলের জন্য ক্ষমা চাইল। সেই সাথে এটা স্বীকার করে নিল যে, বড় গরু দিয়ে কুরবানীর করলেই হবে না। যাকে দিয়ে কুরবানী করা হবে তার প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসাও থাকতে হবে। সাকিবও তার স্বপ্নের কথা সাব্বিরকে বলল, সেই সাথে তাকে ক্ষমা করে দিল। এরপর থেকে সাব্বির আর সাকিবের মধ্যে খুবই সুন্দর বন্ধুত্ব তৈরি হলো।

## কুরবানীর শিক্ষা

*-আব্দুর রহমান*
*সুবার বাজার, পরশুরাম, ফেনী।*

ত্যাগ মহিমার বার্তা নিয়ে
কুরবানীর ঈদ আসে,
চোখের পাতায় ইবরাহীমের
ঐ ইতিহাস ভাসে।
জন্ম-মৃত্যু, ছালাত-ছিয়াম
সবই রবের জন্য,
কুরবানী হোক রবের কাছে
সন্তুষ্টিতে গণ্য।
রক্ত মাংস কোনোকিছু
যায় না রবের কাছে,
বান্দার শুধু দেখেন তিনি
তাক্বওয়া কী আছে।
লোক দেখানো মাংস খেতে
কুরবানী যারা করে,
পশুর গলায় মূল্যবিহীন
ছুরি যেন ধরে।
কুরবানীর ঐ ত্যাগের শিক্ষা
নিতে হবে সবাই,
সবার আগে মনের পশু
দিতে হবে জবাই।

## প্রার্থনা

*-মো. শাহাজাহান হোসেন*
*শিক্ষার্থী, ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর।*

এ পৃথিবী যেমন আছে থাকবে তারই মতো
তুমি আমি চলে যাব আরও মানুষ যতো
কেউ রবে না ধরায় বেঁচে আপন ঠিকানায়–
আঁধার ঘরের পথিক হব সঙ্গী সাথীর মতো।
কর্মে যদি বেঁচে থাকি তবেই সফলকাম
নইলে সাধের দেহ বাড়ির নেই তো কোনো দাম
কাজের শাস্তি আমরা যদি এই দুনিয়ায় পেতাম–
রবই ভালো জানে মোদের কী যে বিপদ হতো!
সময় আছে আমরা যদি দ্বীনের পথে আসি
ইহজীবন, পরলোকে সুখ যে রাশি রাশি
সেদিন পাব রবের ভালোবাসা অনবরত
জান্নাতী ফুল দুলবে দোদুল শান্তি অবিরত।
আমরা অধম তাই গুনাহগার ভুল করেছি, রব!
পাপের খাতা পুণ্য দিয়ে মাফ করে দাও সব
তোমার রহম ছায়াতলে একটু দিও ঠাঁই
দূর করে সব দাও গো প্রভু! মনের কালি-ছাই।

## ডাক এসেছে

*-মিজানুর রহমান*
*মাহমুদপুর, মেলান্দহ, জামালপুর।*

ওই যে শোনো মুয়াজ্জিনের ডাক এসেছে
চারিদিকে রহমতের সুর ভেসেছে।
কাজ ফেলে তাই জলদি ছুটে চলো
আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে মগ্ন করো।
রবের খুশী সকল কাজে থাকবে যতন
জীবন চলুক প্রভুর রাহে সুন্নাহ মতন।

## কুরবানী

*-আবূ বকর ছিদ্দীক্ব*
*ছাত্র, সপ্তম শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,*
*ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।*

নতুন চাঁদ উঠেছে
নীল আকাশের মাঝে,
জাগ্রত হয়েছে মন
কুরবানীর নিয়্যতে।
ক্রয় করতে পশু
সকলে হাটে যায়,
পছন্দমতো ক্রয় করে
সবে নির্দিধায়।
নিজ হাতে যবেহ করে
খুশী করে আল্লাহকে,
সকলের তরে গোশত বিলাতে
প্রশান্তি পাই মনেতে।

# বাংলাদেশ সংবাদ

## সীতাকুণ্ডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

৪ জুন দিবাগত রাত সাড়ে ৯টায় চট্টগ্রাম নগরী থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে সোনাইছড়ি ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামে বিএম ডিপো নামের এক বেসরকারি কন্টেইনার টার্মিনালে আগুন লাগে। পরে রাসায়নিকের কনটেইনারে একের পর এক বিকট বিস্ফোরণ ঘটতে থাকলে বহু দূর পর্যন্ত কেঁপে ওঠে এবং বহু হতাহতের ঘটনা ঘটে। পরে ভয়াবহ আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ডিপোতে আমদানি-রফতানির বিভিন্ন মালামালবাহী কনটেইনার ছিল। খবর পেয়ে আগুন নেভাতে যায় ফায়ার সার্ভিস। পরবর্তী সময়ে অন্য কনটেইনারের বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হন ফায়ার সার্ভিসের অনেক কর্মী। এ দুর্ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের ৯ কর্মীসহ ৪১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে (পরবর্তীতে সংখ্যা বাড়তে পারে)। আহত হয়েছেন ফায়ার সার্ভিস কর্মী, পুলিশ, ডিপোর কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকসহ দুই শতাধিক। তারা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

## শুধু মে মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১০২৯

২০২২ সালের ১ মে থেকে ৩১ মে পর্যন্ত শুধু এক মাসে ৪৬৩১টি সড়কপথ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৩৫৯৪ জন এবং নিহত হয়েছেন ১০২৯ জন। নিহতদের মধ্যে ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সের ৭৭২ জন এবং ৪৪৪ জনই শিক্ষার্থী। ২৪১ জন নারী, শিশু ৯৭ এবং ৮১ জন ষাটোর্ধ্ব। শিক্ষার্থী এবং তরুণদের অধিকাংশের মৃত্যু হয়েছে দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেল চালানোর কারণে। অন্যান্য বাহনগুলোতেও প্রায় একই সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে অর্থাৎ নির্ধারিত গতির চেয়েও অনেক বেশি গতিতে চলার কারণে প্রাইভেটকার, বাস ও ট্রাক দুর্ঘটনাগুলো ঘটেছে। এই সব বাহনের অধিকাংশ চালকের বয়সই ১৮ থেকে ৪০ এর মধ্যে। ২৬টি জাতীয় দৈনিক, বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা ও ইলেকট্রনিক্স চ্যানেলে প্রকাশিত-প্রচারিত তথ্যের পাশাপাশি সারাদেশে সেভ দ্য রোড-এর স্বেচ্ছাসেবীদের তথ্যানুসারে দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেল চালানোর পাশাপাশি নিয়ম না মানা এবং হেলমেট ব্যবহারে অনীহার কারণে ১৩৬৭টি দুর্ঘটনায় আহত ৯৯৪ এবং নিহত হয়েছে ২৭৫ জন। অসাবধানতা ও ঘুমন্ত চোখে-ক্লান্তিসহ দ্রুত চালানোর কারণে ৮৩২টি ট্রাক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৬৩৭, নিহত ১২১ জন। খানা-খন্দ, অচল রাস্তা-ঘাট আর সড়কপথ নৈরাজ্যের কারণে ১১১৬টি বাস দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে ১১০৬, নিহত হয়েছে ৫২০ জন। পাড়া-মহল্লা-মহাসড়কে অসাবধানতার সাথে চলাচলের কারণে লরি, পিকআপ, নসিমন, করিমন, ব্যাটারি চালিত রিকশা-সাইকেল ও সিএনজি দুর্ঘটনা ঘটেছে ১১১৬টি, আহত হয়েছে ৮৫৭, ২২২ জন নিহত হয়েছে। এছাড়াও ১ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত নৌপথ দুর্ঘটনা ঘটেছে ১৪৪টি, আহত ৫২১, নিহত হয়েছে ২৩ জন। রেলপথ দুর্ঘটনা ঘটেছে ২১২টি, আহত হয়েছে ২৮৬, নিহত হয়েছে ২১ জন। আকাশপথে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটলেও বিমানবন্দরের অব্যবস্থাপনার কারণে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়েছে ৫৬ জনকে। সিটি কর্পোরেশনের ময়লার গাড়িতে কেবল ঢাকা নগরীতে আহত হয়েছেন ২৯ জন এবং মৃত্যুবরণ করেছে মে মাসেই ২ জন।

# আন্তর্জাতিক বিশ্ব

## কুরআন পড়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন তামিলনাড়ুর সবরিমালা

ইসলামকে কাছ থেকে জানতে ও বুঝতে মক্কা সফর করেছিলেন তামিলনাড়ুর জনপ্রিয় মোটিভেশনাল স্পিকার ও শিক্ষক সবরিমালা জয়াকান্থন। আর এই সফরই তার জীবন পুরোপুরি বদলে দিল। কা'বার পবিত্র কিসওয়াহ স্পর্শ করে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন, নিজের নাম রাখলেন ফাতেমা সবরিমালা। প্রথমবারের মতো মক্কা সফরে গিয়ে ফাতেমা বলেন, মুসলিমদের প্রতি সারা বিশ্বে এত ঘৃণার কারণ কী? নিজেকে এই প্রশ্ন করার পর নিরপেক্ষ ভাবে কুরআন পড়া শুরু করলাম। ক্রমশ সত্যটা জানলাম। এখন আমি নিজের চেয়েও ইসলামকে বেশি ভালোবাসি। একজন মুসলিম হতে পেরে আমি গর্বিত। একথা বলার পর সকল মুসলিমের কাছে তার অনুরোধ, প্রত্যেকের কাছে কুরআনের বার্তা পৌঁছে দেওয়া হোক। মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে আরও বলেন, আপনাদের ঘরে একটি দুর্দান্ত ও অসাধারণ বই রয়েছে। এটা কেন লুকিয়ে রাখছেন। এই বইটি বিশ্ববাসীর পড়া দরকার। ১৯৮২ সালের ২৬ ডিসেম্বর মাদুরাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন সবরিমালা।

## দরিদ্র দেশগুলো দুর্ভিক্ষের মুখে পড়বে : জাতিসংঘ

ইউক্রেন থেকে খাদ্য সরবরাহ দ্রুত চালু না করা গেলে দুর্ভিক্ষের মুখে পড়বে দরিদ্র দেশগুলো, এমন শঙ্কা জানিয়েছে জাতিসংঘ। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (WFP) জানায়, সংস্থাটির সহায়তা প্রকল্পের ৫০ শতাংশ খাদ্যই আসে ইউক্রেন থেকে। এদিকে বন্দর বন্ধ থাকায় ইউক্রেনে মজুদ থাকা প্রায় ২৫ মিলিয়ন টন শস্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে দেশটির কৃষকদের জন্য। রুশ আগ্রাসনের কারণে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ রয়েছে ইউক্রেন থেকে। দেশটির কৃষকরা বলছেন, ইউক্রেনে এখনও আটকা পড়ে আছে প্রায় ২৫ মিলিয়ন টন শস্য। যা গেল বছরের উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ। সরবরাহ না হওয়ায়, আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি এই বিপুল পরিমাণ শস্য সংরক্ষণ করাও এখন দুশ্চিন্তার

কারণ কৃষকদের কাছে। প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে প্রায় সাড়ে ১২ কোটি মানুষকে খাদ্য সহায়তা দেয় ডব্লিউএফপি। এসব খাদ্যের প্রায় ৫০ শতাংশই আসে ইউক্রেন থেকে। আর এসব খাদ্য শস্য সরবরাহ করা হয় ওডেসা বন্দর থেকে। রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বন্দরটি বন্ধ রয়েছে। ফলে নেই খাদ্য সরবরাহ। জাতিসংঘ বলছে, আফগানিস্তান কিংবা ইথিওপিয়ার মতো দেশের লাখ লাখ মানুষ জাতিসংঘের খাদ্য সহায়তার ওপর নির্ভর করে আছে। যদি খাদ্য সরবরাহ এভাবে বন্ধ থাকলে এসব দেশগুলোর মানুষগুলো চরম দুর্ভিক্ষে পড়বে।

## মুসলিম বিশ্ব

### ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পবিত্র উমরার ভিসা

আবেদনের মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পবিত্র উমরার ভিসা দেবে সঊদী সরকার। বিদেশি উমরা যাত্রীদের জন্য এজেন্সি ছাড়াই ভিসা আবেদনের জন্য অনলাইনভিত্তিক ই-ভিসা অ্যাপ চালু করা হবে। উমরা ভিসার মেয়াদ এক মাস থেকে বাড়িয়ে তিন মাস করা হবে। এ ভিসায় উমরা পালন ছাড়াও যাওয়া যাবে সঊদীর অন্যান্য অঞ্চলে। তাছাড়া নির্দিষ্ট অ্যাপের সাহায্যে প্রয়োজনীয় আবাসন ও পরিবহন ব্যবস্থার কাজও সম্পন্ন করা যাবে। আগে হজ্জযাত্রী ও দর্শনার্থীদের বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে সঊদী আরব আসতে হতো। হজ্জ ও উমরা যাত্রীদের মক্কা-মদীনায় যাতায়াতও এজেন্সির মাধ্যমে হতো। এখন অনলাইনে কোনো ব্যক্তি নিজেই ভিসা ও পছন্দমতো আবাসন ও পরিবহণ বেছে নিতে পারবেন। কোনও এজেন্সির দরকার হবে না। এ বছর সারা বিশ্বের ১০ লাখ মুসলিম হজ্জ পালন করতে পারবেন। এর মধ্যে সঊদী থেকে ১৫ শতাংশ ও সারা বিশ্ব থেকে ৮৫ শতাংশ হজ্জযাত্রী থাকবে।

## সাইন্স ওয়ার্ল্ড

### মানুষের মগজে বসানো হবে মেমোরি চিপ

মেমোরি কার্ড আবিষ্কারের পর বিশ্বে নতুন উচ্চতায় ওঠে প্রযুক্তি। মোবাইলসহ বিভিন্ন যন্ত্রে এই কার্ড যুক্ত করে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। এবার মানুষের মস্তিষ্কে সেই কার্ড বসানো হবে। স্পেসএক্সের মালিক ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান নিউরোটেক স্টার্টআপ নিউরালিঙ্ক এই উদ্যোগ নিচ্ছে। এরই মধ্যে ইঁদুর ও বানরের ওপর এই গবেষণার সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছে নিউরালিঙ্ক। ব্রেন চিপটি স্থাপনের পর বানর মন দিয়ে ভিডিয়ো গেমস খেলতে পারছে, এমন একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করা হয়েছে। এবার মানুষের ওপর পরীক্ষা চালাবে সংস্থাটি। নিউরাল লেস তৈরি করা গেলে তা দিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে মানুষ। প্যারালাইসিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা বা যারা স্মৃতি হারিয়ে ফেলার মতো ভয়ংকর সমস্যার মধ্য দিয়ে গেছেন, মূলত তাদের কথা চিন্তা করেই এই ভাবনা। নিউরালিঙ্ক ডিভাইসটি একটি ছোট্ট কয়েনের আকারের এবং এটি খুব সহজেই মাথার ভেতরে স্থাপন করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে প্রথমে মস্তিষ্কের ব্যাধি এবং রোগে আক্রান্তদের নিরাময় দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। সংস্থাটি দাবি করছে, এই প্রয়োগ সফল হলে পক্ষাঘাত, শ্রবণশক্তি ও অন্ধত্বের সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে ডিভাইসের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যাবে মানুষের স্মৃতি। এটি দিয়ে মস্তিষ্কের সঙ্গে সরাসরি কম্পিউটারকে সংযোগ করা যাবে।

## আদ-দাওয়াহ সংবাদ

### সিলেটে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ

**সিলেট, ২৫ মে ২০২২ :** নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে ও আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ এর সহযোগিতায় দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চালীয় জেলা সিলেটে বন্যাকবলিত প্রায় ৩০০ পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। ত্রাণ বিতরণের পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে পুনর্বাসন এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। জেলার জৈন্তাপুর, কানাইঘাট ও গোয়াইনঘাট উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এসব ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। উক্ত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন-এর সম্মানিত চেয়ারম্যান শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন-এর কোষাধ্যক্ষ, মাসিক আল-ইতিছাম-এর স্টাফ ও আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ-এর সদস্যগণ। উক্ত ত্রাণ বিতরণে সিলেট আত-তাক্বওয়া মসজিদের স্বেচ্ছাসেবকগণ সার্বিক সহযোগিতা করেন। উল্লেখ্য, ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল, ডাল, তেল, চিড়া, লবণ, আলু, পেয়াজ, ওরস্যালাইন ও সাবান।

### সীতাকুণ্ড অগ্নিকাণ্ডে হতাহতদের মাঝে আর্থিক সাহায্য প্রদান

**সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম, ৮ জুন ২০২২ :** চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের বিএম ডিপোর কনটেইনার টার্মিনালে অগ্নিকাণ্ডে আহত ও নিহত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গের নিকট নগদ আর্থিক সহযোগিতা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ টীম তাদের নিয়মিত সেবামূলক কাজের অংশ হিসেবে সেখানে গমন করে। সেখানে প্রশাসনের সহযোগিতায় হতাহতদের তালিকা তৈরি করে বিভিন্ন মেডিকেলে চিকিৎসাধীন আহত ব্যক্তিদের মাঝে তাদের চাহিদা অনুযায়ী নগদ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। পাশাপাশি নিহত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গের মাঝেও আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়াও তাদের মাঝে ঈমান-আমল, মরণ, পরকাল, ছালাত ও কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদির দাওয়াতও প্রদান করা হয়। ফালিল্লাহিল হামদ!

# সওয়াল-জওয়াব

## ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

### ঈমান-আকীদা

**প্রশ্ন (১) : প্রচলিত আছে যে, আল্লাহ তাআলার দুই হাতই ডান হাত। কিন্তু একটি হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর ডান ও বাম হাত আছে। তাহলে কোনটি সঠিক?**

-আব্দুর রশীদ
ঢাকা।

**উত্তর:** মহান আল্লাহর হাতের বিষয়ে ছহীহ হাদীছে ডান ও বাম উভয় হাতের কথাই এসেছে। তবে মহান আল্লাহর বাম হাত শুধুমাত্র নামের দিক থেকেই বাম হাত। কিন্তু সম্মান মর্যাদা ও বরকতের দিক থেকে তার উভয় হাতই ডান হাত। রাসূল ﷺ বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আকাশমণ্ডলী পেঁচিয়ে নিবেন। তারপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে ডান হাতে ধরে বলবেন, আমিই বাদশাহ। কোথায় শক্তিশালী লোকেরা! কোথায় অহংকারীরা? এরপর তিনি বাম হাতে গোটা পৃথিবী গুটিয়ে নিবেন এবং বলবেন, আমিই বাদশাহ। কোথায় অত্যাচারী লোকেরা, কোথায় বড়ত্ব প্রদর্শনকারীরা?' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৮৮; মিশকাত, হা/৫৫২৩)। অত্র হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর ডান ও বাম হাত রয়েছে। আবার অন্য হাদীছে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর দুই হাতই ডান হাত। যেমন রাসূল ﷺ বলেন, 'ন্যায়বিচারকগণ (ক্বিয়ামতের দিন) আল্লাহর নিকটে নূরের মিম্বর সমূহে মহিমান্বিত দয়ালু (আল্লাহ)-এর ডানপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকবেন। আর তার উভয় হাতই ডান হাত (অর্থাৎ সমান মহিমান্বিত)। (সেই ন্যায়পরায়ণ হচ্ছে) ঐসব লোক, যারা তাদের শাসনকার্যে, তাদের পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে এবং তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সমূহের ব্যাপারে সুবিচার করে (ছহীহ মুসলিম, হা/১৮২৭; মিশকাত, হা/৩৬৯০)। উভয় হাদীছের মধ্যে সামঞ্জস্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ডান হাত ও বাম হাত থাকলেও তা সৃষ্টির কোন কিছুর সাথে তুলনীয় নয়। সৃষ্টিজীবের ক্ষেত্রে বাম হাত সাধারণত দুর্বল বা অপরিষ্কার কাজগুলো করে থাকে, কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে তেমনটি নয়। অর্থাৎ সম্মান-মর্যাদা, ক্ষমতা ও দোষ-ত্রুটির ক্ষেত্রে সৃষ্টজীবের হাতের সাথে তাঁর হাত তুলনীয় নয় বরং তার উভয় হাত বরকতময় ও সম্মানিত। তার উভয় হাত তেমন যেমন তার শানে মানায়। (মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনু উছায়মীন, ১/১৬৫, মাউসুআতুল আলবানী ফিল আকীদা, ৬/২৯২-২৯৩)। অতএব উক্ত হাদীছদ্বয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

**প্রশ্ন (২) : জিন জাতির কি বংশ বিস্তার হয়? তাদেরও কি সন্তান-সন্ততি আছে?**

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, নওগাঁ।

**উত্তর :** হ্যাঁ, জিন জাতিরও বংশ বিস্তার হয় এবং তাদেরও সন্তান-সন্ততি আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর স্মরণ করুন, আমরা যখন ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, আদমকে সিজদা করো, তখন ইবলীস ছাড়া তারা সবাই সিজদা করলো। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার রবের আদেশ অমান্য করল। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, অথচ তারা তোমাদের শত্রু। যালেমদের বিনিময় কত নিকৃষ্ট' (সূরা আল-কাহাফ, ১৮/৫০)। এই আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, জিনদের বংশধর আছে, তাদেরও বংশ বিস্তার হয় এবং তাদেরও সন্তান-সন্ততি আছে। তবে কীভাবে বংশ বিস্তার হয় সে সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহতে স্পষ্টভাবে কোনো বর্ণনা আসেনি।

**প্রশ্ন (৩) : বড় শিরক করে মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। কিন্তু কেউ যদি না জেনে ছোট শিরক করে মারা যায় তাহলে কি সে জাহান্নামে শাস্তির পর জান্নাতে প্রবেশ করবে, না-কি সেও চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে?**

- মো. মিনহাজ পারভেজ
হড়গ্রাম, রাজশাহী।

**উত্তর :** ছোট শিরক কবীরা গুণাহ হলেও সেটি ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয় না। তাই কবীরা গুণাহগার ব্যক্তি যেমন চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়, ঠিক তেমনই ছোট শিরককারী ব্যক্তিও চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। বরং সে

একদিন না একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন’ (সূরা আন-নিসা, ৪/৪৮)। এখানে যেই শিরকের গুণাহকে ক্ষমা করা হবে না সেটি আসলে বড় শিরক। কিন্তু ছোট শিরক আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। আল্লাহ তাকে চাইলে ক্ষমা করবেন আর চাইলে তাকে আযাব দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সুতরাং ছোট শিরককারী ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়।

**প্রশ্ন (৪) : কোনো ব্যক্তির আমলনামাতে নেকী ও গুণাহের পরিমাণ সমান সমান হয়ে গেলে, ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, না-কি জাহান্নামে প্রবেশ করবে?**

- মোসা. আফছানা
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

**উত্তর :** যাদের নেকী ও গুণাহের পরিমাণ সমান হবে তারা আরাফ নামক স্থানে ততদিন অবস্থান করবে যতদিন আল্লাহ তাআলা চাইবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর তাদের উভয়ের মধ্যে পর্দা থাকবে। আর আরাফে কিছু লোক থাকবে, যারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দ্বারা চিনবে। আর তারা জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, তোমাদের উপর সালাম। তারা তখনো জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা করে। আর যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামীদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের সঙ্গী করবেন না’ (সূরা আল-আরাফ, ৭/৪৬-৪৭)। আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী আরাফে অবস্থান করার পরে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দিবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘এরাই কি তারা, যাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ তোমাদেরকে রহমতে শামিল করবেন না? (এদেরকেই বলা হবে) তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিতও হবে না’ (সূরা আল-আরাফ, ৭/৪৯)। সুতরাং যাদের নেকী ও গুনাহের পরিমাণ সমান হবে তারা আরাফে অবস্থান করার পরে এক পর্যায়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

**প্রশ্ন (৫) : কুরআনের কপি যদি অনেক পুরাতন হয় এবং তা থেকে যদি পৃষ্ঠা খুলে যায়, তাহলে সেগুলোর জন্য করণীয় কী?**

- মো. আহসানুল্লাহ
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

**উত্তর :** প্রথমত যতটা সম্ভব কুরআনের সেই পৃষ্ঠাগুলো ঠিক করে সেগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। যদি সেটি করা সম্ভব না হয়, সেগুলোকে ভালোভাবে পুড়িয়ে ফেলবে। কেননা উছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু হাফসা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর নিকটে সংরক্ষিত কুরআনের কপি এনে আরো কয়েকটি কপি তৈরি করালেন। তারপর সেগুলোকে বিভিন্ন স্থানে পাঠালেন। আর আলাদা আলাদা বা একত্রিত কুরআনের যে কপিসমূহ রয়েছে তা জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৮৭)।

**প্রশ্ন (৬) : জনৈক আলেম বলেছেন, যে ব্যক্তি শুক্রবারে মৃত্যুবরণ করে তাকে কবরের আযাব থেকে মুক্ত রাখা হয়। এই কথার কোনো ভিত্তি আছে কি?**

- মো. আহসানুল্লাহ
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

**উত্তর :** হ্যা, এই সম্পর্কে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যেটি হাসান (ছহীহুল জামে‘, হা/৫৭৭৩)। আদুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘জুমআর দিনে অথবা জুমআর রাতে কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে কবরের ফিতনা হতে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন’ (তিরমিযী, হা/১০৭৪)।

**প্রশ্ন (৭) : কবরের আযাবের বিষয়টি কি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত?**

-মোখলেছুর রহমান, পাবনা।

**উত্তর :** হ্যাঁ, কবরের আযাবের বিষয়টি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। (১) আল্লাহ বলেন, ‘হে নবী আপনি যদি অত্যাচারীদের (কাফের-মুশরিকদের) দেখতেন, যখন তারা মৃত্যুকষ্টে পতিত হয়, ফেরেশতারা তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, তোমরা তোমাদের আত্মা বের করে দাও। ফেরেশতাগণ এ সময় বলেন, আজ হতে তোমাদেরকে প্রতিফল স্বরূপ অপমানজনক শাস্তি দেয়া হবে’ (আল আনআম, ৬/৯৩)। এখানে কবরের শাস্তিকে অপমানজনক বলা হয়েছে। (২) আল্লাহ বলেন, ‘অবশেষে ফেরাউনের সম্প্রদায়কে আল্লাহর কঠোর শাস্তি ঘিরে ধরে। আর আগুনকে তাদের সামনে সকালে ও সন্ধ্যায় পেশ করা হয়’ (মুমিন, ৪০/৪৫-৪৬)। অর্থাৎ কবরে সকাল-সন্ধ্যা তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি পেশ করা হয়। (৩) আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যারা ঈমান এনেছে,

আল্লাহ তাদেরকে সুদৃঢ় বাক্যের দ্বারা দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা জালেম আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন। আর আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন' (ইবরাহীম, ১৪/২৭)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'কবরে মুসলিমকে যখন প্রশ্ন করা হবে, তখন সে সাক্ষ্য দিবে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" আল্লাহর বাণীতে এর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাণীটি হলো এই, যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে সুদৃঢ় বাক্যের দ্বারা দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন (ছহীহ বুখারী, হা/৪৬৯৯)।

**প্রশ্ন (৮) : জনৈক বক্তা বলেছেন যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজেই জান্নাতীদেরকে সূরা আর-রহমান তেলাওয়াত করে শুনাবেন। এটি কি সঠিক বক্তব্য?**

-মাহফুজুর রহমান
শিবগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ।

**উত্তর :** এ মর্মে কোনো ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। বরং এবিষয়ে কিছু বর্ণনা এসেছে যেগুলোর সবই যঈফ ও জাল (সিলসিলা যঈফা, হা/১২৪৮, ৩২৮২)। সুতরাং এধরনের গায়েবী বিষয় কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীল ছাড়া কোনোভাবেই বিশ্বাস করা যাবে না।

## শিরক

**প্রশ্ন (৯) : সন্তান পেটে আসলে অনেক মহিলা কোমরে বিভিন্ন ধরনের কাঠি বাধে যাতে সন্তান নষ্ট না হয়ে যায়। প্রশ্ন হলো, এগুলো কি শরীআতসম্মত?**

-মিজানুর রহমান, কুষ্টিয়া।

**উত্তর :** সন্তান নষ্ট না হওয়ার জন্য পেটে এধরনের কাঠি ব্যবহার করা শিরক। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু তার স্ত্রীর শরীরে একটি সূতা দেখতে পেয়ে তা ছিড়ে ফেলার পরে বলেছিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, জাদু, তাবীজ ও অবৈধ প্রেম ঘটানোর মন্ত্র শির্ক-এর অন্তর্ভুক্ত (ইবনু মাজাহ, হা/৩৫৩০; আবুদাঊদ, হা/৩৮৮৩)। নবী ﷺ বলেছেন, 'যে লোক কোনো কিছু ঝুলিয়ে রাখে (তাবীজ-তুমার) তাকে তার উপরই সোপর্দ করা হয়' (তিরমিযী, হা/২০৭২)। সুতরাং অবশ্যই এধরনের কাঠি বেধে রাখা পরিহার করতে হবে।

## বিদআত

**প্রশ্ন (১০) : জনৈক ইমাম নিয়মিতভাবে ফজরের ফরয ছালাতের পর মুছল্লীদের সাথে নিয়ে উচৈঃস্বরে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত তেলাওয়াত করেন। এই আমল কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?**

-আব্দুস সামাদ
আয়কর বিভাগ, রাজশাহী।

**উত্তর :** ফজরের ছালাতের পরে নিয়মিতভাবে উচৈঃস্বরে ও নিম্নস্বরে কোনোভাবেই সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত তেলাওয়াতের ব্যাপারে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোনো বর্ণনা আসেনি। সুতরাং এই আমল করা বিদআত, যা বর্জনীয়। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'কেউ যদি এমন আমল করে যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তাহলে সেটি বর্জনীয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)।

উল্লেখ্য যে, ফজরের ছালাত পরে সূরা হাশর পড়ার প্রমাণে যে হাদীছ আছে তা নিতান্তই যঈফ (তিরমিযী, হা/২৯২২)।

**প্রশ্ন (১১) : ঈদের দিনে কবর যিয়ারত করা যাবে কি?**

-আব্দুর রহীম
পবা, রাজশাহী।

**উত্তর :** কবর যিযারত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। রাসূল ﷺ বলেন, 'আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা তা তোমাদের আখেরাতকে স্মরণ করাবে' (ছহীহুল জামে, হা/৩৫৭৭)। তবে কবর যিযারত করার জন্য জুমআ ও দুই ঈদের দিনকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া বিদআত হবে। কেননা এই দুই দিনে খাছ করে দু'আ করার পক্ষে রাসূল ﷺ ও ছাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে কোনো প্রমাণ নেই। রাসূল ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যা শরীআতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)। তবে যেকোনো দিনে, যেকোনো সময়ে কবর যিয়ারত করা যায় (ছহীহ মুসলিম, হা/২২৫৫; মিশকাত, হা/১৭৬৭)।

**প্রশ্ন (১২) : ফরয ছালাতের পর বিভিন্ন দু'আর সাথে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব, নাস ইত্যাদি পড়ার পর বুকে ফুঁ দিয়ে এবং হাতে ফুঁ দিয়ে গোটা শরীর মাসাহ করা কি ঠিক?**

-আলমগীর হোসেন, পাবনা।

**উত্তর:** ফরয ছালাতের পর যিকির, তাসবীহ ও আয়াতুল কুরসীসহ বিভিন্ন সূরা পড়ার কথা হাদীছে স্পষ্ট এসেছে।

কিন্তু সেগুলো পড়ে শরীর মাসাহ করার বিষয়ে কোনো ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। তাই এগুলো পরিহার করা কর্তব্য। তবে রুকইয়া তথা ঝাড়ফুঁকের উদ্দেশ্যে যদি কেউ করে থাকে তাহলে তাতে বাধা নেই (ছহীহ বুখারী, হা/৪৪৩৯, ৫৭৩৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২১৯২)।

## ছালাত

**প্রশ্ন (১৩) : চার রাকআত বিশিষ্ট ছালাতে ইমাম প্রথম বৈঠক না করে তৃতীয় রাকআতে দাঁড়িয়ে যায়। এমতাবস্থায় ইমাম তৃতীয় রাকআত পড়ে বৈঠক করবে, না-কি চার রাকআত পড়ে শেষে সহো সিজদা দিবে?**

-আব্দুস সামাদ
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

**উত্তর :** চার রাকআত বিশিষ্ট ছালাতে প্রথম বৈঠক না করেই যদি ইমাম দাড়িয়ে যায়, তাহলে ছালাত পূর্ণ করে নিতে হবে এবং সালাম ফিরানোর আগে দুটি সহো সিজদা দিতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু বুহাইনাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদেরকে নিয়ে যোহরের ছালাত আদায় করলেন। তিনি প্রথমে দুই রাকআত আদায়ের পর (প্রথম বৈঠকে) না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুক্তাদীগণও তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন। ছালাতের শেষদিকে মুক্তাদীগণ সালামের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বসাবস্থায় তাকবীর দিলেন এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে দুইটি সিজদা করলেন, এরপর সালাম ফিরালেন (ছহীহ বুখারী, হা/৮২৯, ছহীহ মুসলিম, হা/৫৭০)।

**প্রশ্ন (১৪) : ছালাতে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পরে মনে পড়ল আমার ওযূ ছিল না। এমতাবস্থায় করণীয় কী?**

- আনোয়ার হোসেন
কাশিমপুর, গাজীপুর।

**উত্তর :** ছালাতের শর্তগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি শর্ত হলো পবিত্রতা। তাই ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক অথবা ভুলবশতই হোক, পবিত্রতাবিহীন ছালাত আদায় করলে সেই ছালাত বাতিল বলে গণ্য হবে। তাকে আবার পুনরায় সেই ছালাত আদায় করতে হবে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমাদের কারো ওযু নষ্ট হলে পুনরায় ওযু না করা পর্যন্ত মহান আল্লাহ তার ছালাত কবূল করবেন না' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৯৫৪)। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, পবিত্রতা ছাড়া ছালাত কবুল হয় না (ছহীহ মুসলিম, হা/২২৪)। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত এমন পরিস্থিতিতে মনে হওয়ার সাথে সাথে ছালাত ছেড়ে দিতে হবে। তারপর ওযূ করে আবার পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে।

**প্রশ্ন (১৫) : আমি প্রায়ই ফজরের ছালাত জামাআতের সাথে আদায় করতে না পেরে বাসায় শুধু ফরয ২ রাকআত ছালাত আদায় করি। ঘুম থেকে উঠার সাথে সাথে যখন এ ছালাত আদায় করি তখন প্রায় সূর্য উঠার কিছু সময় আগে এবং পরে হয়। এতে কি আমার কোনো পাপ হবে?**

- আশাদুল হক
প্রাণি বিভাগ, ঢাকা কলেজ।

**উত্তর :** এমন অভ্যাস শরীআতে কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং শরীআতের বিধান হলো, সব কিছু ত্যাগ করে জামাআতে ছালাত আদায় করতে হবে। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমার ইচ্ছা হয়, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দেই, অতঃপর ছালাত কায়েমের আদেশ দেই, অতঃপর ছালাতের আযান দেওয়া হোক, অতঃপর এক ব্যক্তিকে লোকদের ইমামতি করার নির্দেশ দেই। অতঃপর আমি লোকদের নিকট যাই এবং তাদের (যারা ছালাতে হাযির হয়নি) ঘর জ্বালিয়ে দেই। (ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৪, ২৪২০; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৫১; মিশকাত, হা/১০৫৩)। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনল অথচ তার জবাব দিলো না ওযর ব্যতীত তার ছালাত কবুল হবে না' (ইবনু মাজাহ, হা/৭৯৩; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/৪২৬)। হাদীছে এটি মুনাফিকদের একটি বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে ভারী ছালাত হলো, ইশা ও ফজরের ছালাত। তারা যদি জানত যে, এই দুই ছালাতে কী প্রতিদান আছে তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও হাযির হতো' (ইবনু মাজাহ, হা/৭৯৭, নাসাঈ, হা/৮৪৩)। সুতরাং নিয়মিতভাবে প্রশ্নে উল্লিখিত সময়ে ছালাত আদায় করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আর এমন সময়ে নিয়মিতভাবে ছালাত আদায়কারী ব্যক্তি অবশ্যই পাপী হবে।

**প্রশ্ন (১৬) : জামাআতে ছালাত আদায়ের সময় ইমাম যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে, তখন পিছনের মুছাল্লীরাও কি তাই বলবে?**

-মুহাম্মাদ রিপন হোসেন
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

**উত্তর :** জামাআতে ছালাত আদায়ের সময় ইমাম যখন ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলবে, তখন পিছনের মুছাল্লীরা বলবে ‘রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ’। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর অনুসরণের জন্য। তাই যখন তিনি তাকবীর বলেন, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে, যখন তিনি রুকূ করেন তখন তোমরাও রুকূ করবে। যখন ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলেন, তখন তোমরা বলবে ‘রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ’। আর তিনি যখন সিজদা করেন তখন তোমরাও সিজদা করবে’ (ছহীহ বুখারী, হা/৭৩৪, ছহীহ মুসলিম, হা/৪১১)। তবে মুক্তাদীগণও ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলতে পারে। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর অনুসরণের জন্য’ (ছহীহ বুখারী, হা/৭৩৪)। হাদীছের এই অংশ প্রমাণ করে যে, মুক্তাদীগণও ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলতে পারে।

**প্রশ্ন (১৭) : বাড়িতে বা অন্যখানে একাকী ছালাত আদায় করলে আযান ইক্বামত ছাড়া ছালাত কবুল হবে কি?**

-হুমাউন কবীর
বগুড়া।

**উত্তর :** আযান ও ইক্বামত ছাড়া ছালাত কবুল হলেও একাকী ছালাত আদায়কারীর জন্য আযান ও ইক্বামত দেওয়াই সুন্নাত। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তাকে তার পিতা সংবাদ দিয়েছেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তাঁকে বললেন, আমি দেখছি তুমি ছাগল চরানো এবং বন-জঙ্গলকে ভালোবাস। তাই তুমি যখন ছাগল নিয়ে থাক, বা বন-জঙ্গলে থাক এবং ছালাতের জন্য আযান দাও, তখন উচ্চকণ্ঠে আযান দাও। কেননা, জিন, ইনসান বা যে কোনো বস্তুই যতদূর পর্যন্ত মুয়াযযিনের আওয়াজ শুনবে, সে ক্বিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, একথা আমি আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট শুনেছি (ছহীহ বুখারী, হা/৬০৯)। সুতরাং আযান ও ইক্বামত দিয়েই ছালাত আদায় করতে হবে।

**প্রশ্ন (১৮) : হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, যোহরের পূর্বে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চার রাকআত ছালাত আদায় করতেন। আবার ফরয ছালাতের পরেও চার রাকআত পড়ার কথা আছে। প্রশ্ন হলো উক্ত চার রাকআত ছালাত দুই দুই রাকআত করে আদায় করতে হবে না-কি এক সালামেই চার রাকআত আদায় করতে হবে?**

–শামীম হোসেন
বাগমারা, রাজশাহী।

**উত্তর :** যোহরের পূর্বে চার রাক‘আত সুন্নাত দুই রাকআত করে পড়াই উত্তম। উল্লেখ্য, এক সালামে চার রাকআত ছালাত আদায় করা মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ (আবু দাঊদ, হা/১২৭০)।

**প্রশ্ন (১৯) : বিতর ছালাতের পরে নির্দিষ্ট কোনো দু‘আ আছে কি?**

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

**উত্তর :** হ্যাঁ, বিতর ছালাতের পরে নির্দিষ্টভাবে নিম্নোক্ত দু‘আটি পড়া যায়। তা হলো, سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ‘সুবহানাল মালিক্বিল কুদ্দূস’। এটি তিনবার পড়বে। তবে তৃতীয়বার পড়বে একটু উচ্চৈঃস্বরে। উবাই ইবনে কাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন বিতর ছালাতের সালাম ফিরাতেন, তখন বলতেন, ‘সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস’ (আবুদাঊদ, হা/১৪৩০; নাসাঈ, হা/১১৬৯; মিশকাত, হা/১২৭৪)। নাসাঈর অপর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন (বিতরের) সালাম ফিরাতেন, তখন তিনবার বলতেন, ‘সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস’ এবং তৃতীয়বার স্বর উঁচু করতেন (নাসাঈ, হা/১৭৩২; মিশকাত, হা/১২৭৫)।

**প্রশ্ন (২০) : বিতর ছালাতে কি প্রতিদিন হাত তুলে দু‘আ কুনূত করা যাবে, না-কি এটি বিদআত বলে গণ্য হবে?**

-ফযলে রাব্বী, রাজশাহী।

**উত্তর :** দু‘আ কুনূত হাত তুলে পড়া যায় (বায়হাক্বী, ২/২১১-২১২; মির‘আত, ৪/৩০০; তুহফা, ২/৫৬৬-৬৭)। আবার হাত না তুলে রুকূর পূর্বে ক্বিরাআতের সাথেও পড়া যায় (ইরওয়াউল গালীল, ২/৭১ পৃ.)। হাসান ইবনু আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে এমন কিছু বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন যা আমি বিতর ছালাতে পাঠ করি (আবু দাঊদ, হা/১৪২৫)। বিতর ছালাতে দুআ কুনূত পড়া সুন্নাত। তবে তা নিয়মিত রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পড়েছেন এ মর্মে কোনো হাদীছ পাওয়া যায় না। বরং আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) নিজে নিয়মিত পড়তেন মর্মে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যার সনদটি মুনকাতি সূত্রে বর্ণিত

হয়েছে। অপর পক্ষে নিয়মিত না পড়ার ব্যাপারে আলী, উমার ও উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু আনহুম সহ অনেকের হতে আছার বর্ণিত হয়েছে (তুহফাতুল আহওয়াযী, ২/৪৬২) । বিধায় নিয়মিত না পড়ে মাঝে মাঝে ছাড়াই শ্রেয় হবে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

**প্রশ্ন (২১) : একই ইমাম ঈদের জামাআতে একাধিক বার ইমামতি করতে পারে কি? ছাহাবায়ে কেরামের জীবনে এরূপ কোনো আমল আছে কি?**

-মীযানুর রহমান
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

**উত্তর:** একই ইমাম একই ঈদের ছালাত একাধিক বার পড়িয়েছেন মর্মে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার ছাহাবীগণের কোনো আমল পাওয়া যায় না। তবে একই ছালাত একাধিকবার পড়ার বিষয়টি প্রমাণিত। মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে ইশার ছালাত পড়তেন এবং নিজ সম্প্রদায়ে গিয়ে আবার তাদের ইমামতি করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭১১; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৬৫; মিশকাত, হা/১১৫০)। এক্ষণে ইমামের অভাবে যদি এরূপ করতে হয়, তাহলে তা শরীআতে জায়েয হবে। কেননা ছালাতুল খওফে রাসূল একদলকে নিয়ে একবার ইমামতি করেছেন। আরেক দলকে নিয়ে তিনি আবার ইমামতি করেছেন (নাসাঈ, হা/১৫৫২)।

## জানাযা

**প্রশ্ন (২২) : জানাযা পড়ানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যোগ্য কে? মৃতের আত্মীয়স্বজন, না-কি এলাকার ইমাম? একজন আলেম বলেছেন, মসজিদের ইমামই বেশি হক্বদার। তার কথা কি ঠিক?**

- মো. আহসানুল্লাহ
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

**উত্তর :** অছীয়তকৃত ব্যক্তি মৃতব্যক্তির জানাযা পড়ানোর বেশী হক্বদার। তারপর আমীর বা তার প্রতিনিধি বা মসজিদের ইমাম মৃতব্যক্তির জানাযা পড়ানোর ক্ষেত্রে বেশী হক্বদার (আল মুগনী, ৩/৪০৭)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির নিজস্ব প্রভাবাধীন এলাকায় ইমামতি করবে না কিংবা তার অনুমতি ছাড়া তার বাড়িতে তার বিছানায় বসবে না' (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৭৩)। হাসান ইবনু আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু মৃত্যুবরণ করলে হুসাইন ইবনু আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু মদীনার আমীর সাঈদ ইবনুল আসকে হাসান রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর জানাযার ইমামতি করার জন্য বললেন। তারপর হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, এটি যদি সুন্নাত না হতো, তাহলে কখনোই আমি পিছনে থাকতাম না (মুসতাদরাক হাকেম, হা/৪৭৯৯)। এই বিষয়ে এর চেয়ে বড় দলীল আর নেই। কেননা হাসান রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর জানাযাতে অনেক ছাহাবী উপস্থিত ছিলেন (আত-তালখীছুল হাবীর লি ইবনু হাজার, ২/২৮৮)। আর যেহেতু জানাযার ছালাত জামাআতের সাথে আদায় করতে হয়, তাই অন্যান্য ছালাতের মতো এই ছালাতের ইমামতি করাতে ইমামই বেশী হক্বদার (আল মুগনী, ৩/৪০৭)।

## হজ্জ

**প্রশ্ন (২৩) : কী পরিমাণ সম্পদ থাকলে কোনো ব্যক্তির ওপর হজ্জ ফরয হবে?**

-দুলাল হোসেন
কুমিল্লা

**উত্তর :** যদি কোনো ব্যক্তির নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা, দৈহিক সক্ষমতা থাকে এবং আর্থিকভাবে কা'বা ঘরে যাওয়া ও আসার সমপরিমাণ সম্পদ থাকে এবং এ সময়ে পরিবার পরিজনের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে, তাহলে তার ওপর হজ্জ ফরয (আলে ইমরান, ৩/৯৭)। অনেকের উপর হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন অজুহাতে অলসতা করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি হজ্জের সংকল্প করে, সে যেন দ্রুত সেটা সম্পাদন করে' (আবুদাঊদ, হা/১৭৩২, মিশকাত, হা/২৫২৩)।

**প্রশ্ন (২৪) : আর্থিক সামর্থ্য আছে কিন্তু হজ্জে যেতে অক্ষম এমন ব্যক্তি কিংবা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করা যাবে কি?**

-আব্দুল্লাহ কাওছার
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

**উত্তর:** হ্যাঁ, এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা যাবে। আবূ রাযীন উক্বায়লী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, একদা তিনি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ, হজ্জ ও উমরা করতে সক্ষম নয় এবং বাহনে বসতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ ও উমরা করো' (তিরমিযী, হা/৯৩০; আবূ দাঊদ, হা/১৮১০; নাসাঈ, হা/২৬২১; মিশকাত, হা/২৫২৮)। তবে হজ্জ আদায়কারীকে

নিজের হজ্জ পূর্বে আদায় করতে হবে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, আমি শুবরোমার পক্ষ হতে হজ্জের নিয়্যত করছি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'শুবরোমা কে? সে বলল, আমার এক ভাই অথবা বলল, আমার এক আত্মীয়। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি নিজের হজ্জ করেছো? সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি প্রথমে নিজের হজ্জ করো অতঃপর শুবরোমার হজ্জ করবে' (মুসনাদুশ শাফেঈ, হা/১০০০; আবূ দাঊদ, হা/১৮১১; ইবনু মাজাহ, হা/২৯০৩)। তবে এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে শুধু উমরা করা যাবে না এবং এক হজ্জের সাথে একাধিক উমরাও করা যাবে না।

**প্রশ্ন (২৫) : ঈদুল আযহার দিন ছালাত আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত ছিয়াম থাকা ও কুরবানীর কলিজা দ্বারা ইফতারী করা কি সুন্নাত?**

-মিলন হুসাইন
রহিমানপুর, ঠাকুরগাঁও।

**উত্তর:** ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈদুল ফিতরে খেয়ে ঈদের মাঠে যাওয়া এবং ঈদুল আযহাতে ঈদের মাঠ থেকে এসে খাওয়া সুন্নাত (তিরমিযী, হা/৫৪২; ইবনু মাজাহ, হা/১৭৫৬; মিশকাত, হা/১৪৪০)। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কুরবানীর গোশত হতে খেতেন (আহমাদ, হা/২৩০৩৪)। অপর বর্ণনায় আছে, '...তিনি ঈদুল আযহার দিন খেতেন না (পশু) যবেহ না করা পর্যন্ত' (ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/১৪২৬; বায়হাক্বী, হা/৫৯৫৪; ছহীহুল জামে', হা/৪৮৪৫, সনদ ছহীহ)। অবশ্য কুরবানীর গোশত দিয়ে খাওয়া উত্তম। বিদায় হজ্জের দিন তিনি ১০০টি উটের প্রতিটি থেকে একটু করে অংশ নিয়ে এক পাত্রে রান্না করে সেখান থেকে গোশত খেয়েছিলেন ও ঝোল পান করেছিলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৩০০৯; ইবনু মাজাহ, হা/৩০৭৪; মিশকাত, হা/২৫৫৫)। তবে কলিজা খাওয়া মর্মে বর্ণিত হাদীছটি দুর্বল (সুবুলুস সালাম, ১/৪২৮; তা'লীক্ব আলবানী, ২/২০০)। উল্লেখ্য যে, ঈদুল আযহার দিন না খেয়ে থাকাকে ছিয়াম বলা এবং ঈদগাহ থেকে এসে খাওয়াকে ইফতারী বলার কোনো প্রমাণ শরীআতে পাওয়া যায় না।

**প্রশ্ন (২৬) : যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের ফযীলত কী?**

-নাজিউর রহমান
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী।

**উত্তর:** যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের নেক আমল মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় এবং এর ফযীলত জিহাদের চেয়েও বেশি। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, '(বছরের) যে কোনো দিনের সৎ আমলের চেয়ে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের নেক আমল মহান আল্লাহর নিকটে অধিকতর প্রিয়'। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়েও কি? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়েও। তবে সেই ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র, যে তার জানমাল নিয়ে জিহাদে বের হয়েছে এবং কোনো একটিও নিয়ে ফিরে আসেনি (অর্থাৎ শহীদ হয়ে গেছে)' (আবূ দাঊদ, হা/২৪৩৮; তিরমিযী, হ/৭৫৭; ইবনু মাজাহ, হা/১৭২৭; মিশকাত, হা/১৪৬০, সনদ ছহীহ)।

## কুরবানী সংক্রান্ত বিধান

**প্রশ্ন (২৭) : কুরবানী করা ওয়াজিব না-কি সুন্নাত?**

-আব্দুল মালেক, রাজশাহী।

**উত্তর :** কুরবানী ওয়াজিব বা ফরয নয়; বরং সক্ষম ব্যক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি; যাতে তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণস্বরূপ যেসব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সেসবের উপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে' (আল-হাজ্জ, ২২/৩৪)। উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন (যিলহাজ্জ মাসের) প্রথম দশদিন উপস্থিত হয়, আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করে, তবে সে যেন তার চুল ও নখের কিছুই স্পর্শ না করে অর্থাৎ না কাটে' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৭৭)। এই হাদীছে কুরবানীকে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীদাতার ইচ্ছাধীন করেছেন। সুতরাং এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, কুরবানী করা সুন্নাত। মানুষ ফরয মনে করবে এই ভয়ে আবূবকর এবং ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা মাঝে মধ্যে কুরবানী করতেন না (বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, হা/১৯৫০৬-৭)। অতএব কুরবানী করা সুন্নাত।

**প্রশ্ন (২৮) : যিলহজ্জের চাঁদ উঠার পর নখ, চুল, গোঁফ ইত্যাদি কাটা উচিত নয়। এই বিধান কি শুধু কুরবানীদাতার জন্য না-কি পরিবারের সকল সদস্যের জন্য?**

-সাব্বির হোসেন
বাগমারা, রাজশাহী।

**উত্তর :** এ বিধান পরিবারের সবার উপর প্রযোজ্য নয়; বরং

তা শুধু কুরবানীদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উম্মু সালামা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যখন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে, আর তোমাদের কেউ যদি কুরবানী করার মনস্থ করে, তাহলে সে যেন চুল কিংবা নখ না কাটে' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৭৭; মিশকাত, হা/১৪৫৯)। হাদীছে উল্লেখিত বিষয়টি শুধু কুরবানীদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পরিবারের সকলের জন্য নয়। কাজেই পরিবারের অন্য সদস্যগণ আদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়।

**প্রশ্ন (২৯) : কুরবানীর নিয়্যতে ক্রয়কৃত পশু ত্রুটিযুক্ত হলে সেই পশু দিয়ে কুরবানী দেওয়া যাবে কি?**

-আহমাদ
কাটাখালী, রাজশাহী।

**উত্তর :** কুরবানীর উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত সুস্থ পশু যদি রোগাক্রান্ত কিংবা কোনো দুর্ঘটনায় ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়, তাহলে উক্ত পশু দিয়ে কুরবানী করতে শারঈ কোনো বাধা নেই। আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তার কাছে হজ্জের কুরবানীর পশুসমূহের মধ্যে একটি কানা পশু নিয়ে আসা হলো। তখন তিনি বললেন, যদি পশুটি তোমাদের কেনার পরে কানা হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা তা কুরবানীতে চালিয়ে দাও। আর যদি তোমাদের কেনার আগে থেকেই কানা হয়ে থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে অন্য একটি কুরবানী দাও' (বায়হাক্বী, সুনানে ছুগরা, হা/১৭৭৪)। ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, হাদীছটির সনদ ছহীহ (আল-মাজমূ', ৮/৩৬৩)।

**প্রশ্ন (৩০) : ক্বিয়ামতের মাঠে কুরবানীর পশুর লোম, শিং ও খুর উপস্থিত হবে। একথা কি ঠিক?**

-আসাদুজ্জামান
বগুড়া।

**উত্তর:** উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ (যঈফ তিরমিযী, হা/১৪৯৩; সিলসিলা যঈফা, হা/৫২৬, ২/১৪; যঈফ তারগীব, হা/৬৭১, ১/১৭০)। এছাড়া উক্ত হাদীছ কুরআনের আয়াতের বিরোধী। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহর নিকটে কুরবানীর গোশত ও রক্ত পৌঁছে না; বরং তোমাদের তাক্বওয়া তাঁর নিকট পৌঁছে' (আল-হজ্জ, ২২/৩৭)।

**প্রশ্ন (৩১) : কুরবানীর চামড়ার টাকা মসজিদ ও মাদরাসায় দেওয়া যাবে কি?**

-আবূ তাহের
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

**উত্তর :** কুরবানীর চামড়ার টাকা মসজিদে দেওয়া যাবে না। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে কুরবানীর চামড়া ফকীর-মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করার আদেশ করেছিলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১৩১৭)। কিন্তু তিনি তাকে মসজিদে দেওয়ার আদেশ করেননি। তবে মাদরাসা 'ফী সাবীলিল্লাহ'র অন্তর্ভুক্ত হিসাবে চামড়া ও যাকাত-ওশরের টাকা সেখানে প্রদান করা যায় (ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃ. ৪৪২, ফতওয়া নং ৩৮৬; মাজমূ'উ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল, ১৮/২৫২-২৫৩)।

**প্রশ্ন (৩২) : একই পশুতে কুরবানী ও আক্বীক্বা করা যাবে কি?**

-এহসানুল হক্ব
পলিখাঁপুর, দিনাজপুর।

**উত্তর :** না, একই পশুতে কুরবানী ও আক্বীক্বা করা যাবে না। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ধরনের আমলের অস্তিত্ব ছিল না (নায়লুল আওত্বার, ৬/২৬৮, 'আক্বীক্বা' অধ্যায়; মিরআত, ২/৩৫১ ও ৫/৭৫)। কুরবানী ও আক্বীক্বা দুটি পৃথক বিষয়। পৃথকভাবেই তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

**প্রশ্ন (৩৩) : কুরবানীর গোশত সমানভাবে তিন ভাগে ভাগ করা কি জরুরী? কুরআন-হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।**

-মিলন হুসাইন
রহিমানপুর, ঠাকুরগাঁও।

**উত্তর :** কুরবানীর গোশত সমানভাবে তিন ভাগে ভাগ করার বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং তা নিজে খাবে এবং আত্মীয়-স্বজন ও ফকীর-মিসকীনকে খাওয়াবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, '...তা হতে তোমরা নিজেরা খাও এবং হতদরিদ্রদের খাওয়াও' (আল-হজ্জ, ২২/২৮)। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, '...তোমরা তা থেকে খাও এবং মিসকীন ও ফক্বীরকে খাওয়াও' (আল-হজ্জ, ২২/৩৬)। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথমদিকে তিন দিনের বেশি কুরবানীর গোশত জমা রাখতে নিষেধ করেছিলেন। পরবর্তীতে জমা রাখার অনুমতি দেওয়া হলে ছাহাবীগণ বললেন, আপনি তো তিন দিনের বেশি কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলেন? তখন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'গ্রাম থেকে অনেক অভাবী লোক আসার কারণে আমি সেই বছরে নিষেধ করেছিলাম। এখন যেহেতু সেই পরিস্থিতি নেই, অতএব তোমরা খাও, জমা রাখ এবং দান করো' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৭১)। পূর্বোক্ত আয়াতদ্বয়ে নিজে খাওয়া এবং দুই শ্রেণির মানুষকে খাওয়ানোর কথা বলা হয়েছে। আর হাদীছে পরিস্থিতি অনুযায়ী দান করতে

বলা হয়েছে। অতএব, এলাকায় অভাবী লোকের সংখ্যা বেশি হলে নিজে খাওয়ার তুলনায় দান করতে হবে বেশি। আর অভাবীর সংখ্যা কম হলে নিজের ইচ্ছামতো খাওয়া বা দান করা যেতে পারে। তবে তিন ভাগ না করলে মানুষ গোনাহগার হবে বিষয়টি এমন নয়।

**প্রশ্ন (৩৪) : প্রতিবেশীকে কুরবানীর গরুর গোশত দিয়ে সমপরিমাণ অথবা কম কিংবা বেশি করে ছাগলের গোশত নেওয়া যাবে কি?**

-ছিদ্দীক্ব
চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর।

**উত্তর :** এরূপ পরিমাণভিত্তিক লেনদেনের ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের কোনো আমল পাওয়া যায় না। তাই কুরবানীর গোশতের ক্ষেত্রে এই ধরনের লেনদেন করা উচিত নয়। তবে প্রতিবেশী বা আত্মীয়স্বজনের নিকট থেকে হাদিয়াস্বরূপ কিছু নেওয়া এবং তাদেরকে কিছু দেওয়া যায়। রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘হাদিয়া দাও, মহব্বত বাড়বে’ (আল আদাবুল মুফরাদ, হা/৫৯৪; মিশকাত, হা/৪৬৯৩)। অন্য হাদীছে এসেছে, ‘রাসূল ﷺ হাদিয়া নিতেন এবং তার বদলা দিতেন’ (ছহীহ বুখারী, হা/২৫৮৫; মিশকাত, হা/১৮২৬)।

**প্রশ্ন (৩৫) : কুরবানীর পশু যবেহকারীকে পারিশ্রমিক হিসাবে গোশত দেওয়া যাবে কি?**

-রকীবুল ইসলাম
বাগমারা, রাজশাহী।

**উত্তর :** কুরবানীর গোশত থেকে কাউকে পারিশ্রমিক হিসাবে কিছু দেওয়া যাবে না। আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তাকে তার কুরবানীর পশুর পাশে দাঁড়াতে, এদের গোশত, চামড়া ও পিঠের আবরণসমূহ বিতরণ করতে এবং তা হতে কাউকে পারিশ্রমিক হিসাবে কিছু না দিতে নির্দেশ দেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৭১৭)। তবে যবেহকারী কুরবানীর গোশত পাওয়ার হক্বদার হলে হক্বদার হিসাবে কিছু দেওয়া যেতে পারে (মুগনী, ১১/১০)। তবে তাকে তার পারিশ্রমিক দিতে হবে (ইবনু মাজাহ, হা/২৪৪৩; ইরওয়াউল গালীল, হা/১৪৯৮; মিশকাত, হা/২৯৮৭)।

**প্রশ্ন (৩৬) : টাকা ধার নিয়ে কুরবানী দেওয়া যাবে কি?**

-আব্দুল আলিম
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

**উত্তর:** কুরবানী আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। বছরে মাত্র একবার কুরবানী দেওয়ার সুযোগ আসে। তাই যথাসাধ্য কুরবানী দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। ঋণ করা ব্যতীত কুরবানী দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে এবং মাসিক বেতন কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে অল্প সময়ে ঋণ পরিশোধ করার উপায় থাকলে ঋণ করে কুরবানী করাতে শারঈ কোনো বাধা নেই (মাজমূউল ফাতাওয়া লি-ইবনে তায়মিয়া, ২৬/৩০৫; ফাতাওয়া বিন বায, ১/৩৭)।

**প্রশ্ন (৩৭) : সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা কুরবানী করেনি, তাদেরকে গোশত দেওয়া যাবে কি?**

-আব্দুল হামীদ
তালা, সাতক্ষীরা।

**উত্তর:** হ্যাঁ, যাবে। কেননা সামর্থ্য থাকলেই কুরবানী করা জরুরী নয়। বরং কুরবানী একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। কোনো সময় কেউ ছেড়ে দিলে গোনাহগার হবে না। আবূ বকর ও উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কখনো কখনো কুরবানী করেননি (ইরওয়াউল গালীল, হা/১১৩৯, ৪/৩৫৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ, ৪/১৭৭)। আবূ মাসঊদ আনছারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেছেন, ‘সামর্থ্য থাকার পরও আমি কুরবানী দিই না এই আশঙ্কায় যে, আমার প্রতিবেশীগণ হয়ত মনে করবে কুরবানী দেওয়া আমার জন্য জরুরী’ (ইরওয়াউল গালীল, ৪/৩৫৫)। তাই তাদেরকে হাদিয়াস্বরূপ কুরবানীর গোশত দেওয়াতে কোনো বাধা নেই।

**প্রশ্ন (৩৮) : মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী দেওয়া যাবে কি?**

-আব্দুছ ছামাদ
ডুমুরিয়া, খুলনা।

**উত্তর :** মৃত ব্যক্তির নামে পৃথক কুরবানী দেওয়া শরীআতসম্মত নয়। কেননা তা রাসূল ﷺ-এর কথা, কর্ম বা সম্মতি কোনোটির দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই ফাতেমা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) ছাড়া তার সকল সন্তান, দুই স্ত্রী খাদীজা ও যায়নাব বিনতে খুযায়মা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) এবং চাচা হামযা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) প্রমুখ মৃত্যুবরণ করেছিলেন। অথচ তিনি তাদের কারও পক্ষ থেকেই কুরবানী করেননি। তাছাড়া রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় কোনো ছাহাবী কাছের কিংবা দূরের কোনো মৃতের নামে কুরবানী করেছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায় না (মাজমূ‘ ফাতাওয়া শায়খ উছায়মীন, ১৭/২৬৭)। সুতরাং মৃতব্যক্তির নামে কুরবানী করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

**প্রশ্ন (৩৯) : একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ কতটি পশু কুরবানী করতে পারে?**

-তানভীরুল ইসলাম
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

**উত্তর :** একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কুরবানীই যথেষ্ট। আত্বা ইবনু ইয়াসার বলেন, আমি আবূ আইয়ূব আনছারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে কীভাবে কুরবানী হতো? তিনি বললেন, একজনে পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কুরবানী করত। সেটা থেকে তারা খেত এবং মানুষকে খাওয়াত। অবশেষে মানুষেরা গর্ব ও আভিজাত্যের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ফলে পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তা তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছ (তিরমিযী, হা/১৫০৫)। তবে সামর্থ্য অনুপাতে একাধিক পশু কুরবানী করতে পারে। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিংওয়ালা সাদা-কালো রঙের দুটি ভেড়া কুরবানী করেছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৬৪, ৫৫৬৫)। অপর বর্ণনায় আছে, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একসাথে ১০০টি উট কুরবানী করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮; ইবনু মাজাহ, হা/৩০৭৪)।

**প্রশ্ন (৪০) : মহিলারা কি কুরবানীর পশু যবেহ করতে পারবে?**

-আব্দুল্লাহ আল মামুন।
কুষ্টিয়া।

**উত্তর :** মহিলারা কুরবানীর পশুসহ যেকোনো হালাল পশু যবেহ করতে পারবে। ইবনু কা'ব ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তার কতকগুলো ছাগল বা ভেড়া ছিল, যা সাল নামক স্থানে চরে বেড়াতো। একদিন আমাদের এক দাসী দেখল যে, আমাদের ছাগল বা ভেড়ার মধ্যে একটি ছাগল মারা যাচ্ছে। তখন সে একটি পাথর ভেঙ্গে তা দিয়ে ছাগলটাকে যবেহ করে দিল। কা'ব তাদেরকে বললেন, তোমরা এটা খেয়ো না, যে পর্যন্ত না আমি নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করে আসি অথবা কাউকে নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে পাঠাই। তিনি নিজেই নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন অথবা কাউকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা খাওয়ার হুকুম দিয়েছিলেন। উবাইদুল্লাহ বলেন, এ কথাটা আমার কাছে খুব ভালো লাগল যে, দাসী হয়েও সে ছাগলটাকে যবেহ করল। (ছহীহ বুখারী, হা/২৩০৪; মিশকাত হা/৪০৭২)। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, মহিলারাও পশু যবেহ করতে পারবে।

**প্রশ্ন (৪১) : কুরবানীর জন্য একটি পশুতে সর্বোচ্চ কত জন অংশগ্রহণ করতে পারে?**

-রাকিব হাসান
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

**উত্তর :** প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে একটি করে কুরবানী হওয়াই ভালো। কারণ রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'হে লোক সকল! প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে একটি করে কুরবানী দেওয়া কর্তব্য' (আবূ দাঊদ, হা/২৭৮৮; মিশকাত, হা/১৪৭৮)। আত্বা ইবনু ইয়াসার বলেন, আমি আবূ আইয়ূব আনছারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে কীভাবে কুরবানী হতো? তিনি বললেন, একজনে পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কুরবানী করত। সেটা থেকে তারা খেত এবং মানুষকে খাওয়াতো। অবশেষে মানুষেরা গর্ব ও আভিজাত্যের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ফলে পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তা তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছ (তিরমিযী, হা/১৫০৫)। তবে একটি উট ও গরুতে সাত জন শরীক হতে পারে। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'গরু সাত জনের পক্ষ থেকে এবং উট সাত জনের পক্ষ থেকে' (আবূ দাঊদ, হা/২৮০৮; তিরমিযী, হা/৯০৪; মিশকাত, হা/১৪৫৮)। তবে উটে দশ জনও শরীক হওয়া যায় (ইবনু মাজাহ, হা/৩১৩১, সনদ ছহীহ)। উল্লেখ্য যে, হাদীছগুলোতে সফরের কথা উল্লেখ থাকলেও হাদীছগুলোর আমল সফরের সাথে খাছ নয়। সফরে হোক আর মুক্বীম অবস্থায় হোক গরুতে সাতজন ও উটে দশজন অংশগ্রহণ করতে পারে।

**প্রশ্ন (৪২) : একটি গরু বা উটে সাতজনের কম সংখ্যক লোক শরীক হয়ে কি কুরবানী দিতে পারবে?**

-মাহফুজর রহমান
পাবনা।

**উত্তর :** কুরবানীর ক্ষেত্রে উত্তম হলো, প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে একটি করে কুরবানী দেওয়া। কারণ রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'হে লোক সকল! প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে একটি করে কুরবানী দেওয়া কর্তব্য' (আবূ দাঊদ, হা/২৭৮৮; মিশকাত, হা/১৪৭৮)। তবে একটি গরুতে সাতজন অংশগ্রহণ করতে পারে। এর চেয়ে বেশি নয়। জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হজ্জের ইহরাম বেঁধে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে রওনা হলাম। তিনি আমাদেরকে প্রতিটি উট বা গরু সাতজনে মিলে কুরবানী করার নির্দেশ দিলেন (ছহীহ মুসমি, হা/১৩১৮)। সাত ভাগের কমে কুরবানী দেওয়ার ব্যাপারে কোনো সীমাবদ্ধতা পাওয়া যায় না। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

বিদায় হজ্জের দিন একশতের বেশি উট কুরবানী করেছিলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১৩১৭)। সাতভাগে কুরবানীর ব্যাপারে যেমন হাদীছ পাওয়া যায় তেমন এক ব্যক্তি একটি গরু কুরবানী দেওয়ার ব্যাপারেও হাদীছ পাওয়া যায় (ছহীহ মুসলিম, হা/১৩১৯)। উটে সাতভাগের যেমন দলীল পাওয়া যায় তেমন দশভাগেরও দলীল পাওয়া যায় (ছহীহ ইবনু মাজাহ, হা/২৫৫৩)। তবে কমেও কুরবানী দেওয়া যেতে পারে (আল-ইনসাফ ফি মা'রেফাতির রাজেহ মিনাল খিলাফ, ৪/৭৬ পৃ.)।

**প্রশ্ন (৪৩) : সবচেয়ে উত্তম কুরবানী কোনটি, উট, গরু নাকি ছাগল?**

-আতাউর রহমান

বগুড়া।

**উত্তর :** কুরবানীর ক্ষেত্রে সর্বোত্তম কুরবানী হলো পুরো একটি উট কুরবানী দেওয়া, তারপর গরু, তারপর ছাগল, তারপর উট বা গরু ভাগ দেওয়া। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুমুআর দিন প্রথম পর্যায়ে জানাবাত গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং ছালাতের জন্য আগমন করে সে যেন একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন একটি গাভী কুরবানী করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। চতুর্থ পর্যায়ে আগমন করল সে যেন একটি মুরগী কুরবানী করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল' (ছহীহ বুখারী, হা/৮৮১, ছহীহ মুসলিম, হা/৮৫০)।

## হালাল হারাম

**প্রশ্ন (৪৪) : স্মার্টফোনে বিভিন্ন ধরনের গেমস খেলা যায়। ইসলামী শরীআতে এগুলো কি হালাল?**

-আরিফুল ইসলাম, রাজশাহী।

**উত্তর :** না, এসব গেমস হালাল নয়, তাই এগুলো খেলা যাবে না। কেননা এতে যথেষ্ট সময় অপচয় হয়। আর যে খেলায় সময়ের অপচয় হয়, দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে না এবং আল্লাহর যিকির ও ছালাত হতে বিরত রাখে তা শয়তানের কাজ (আল-মায়েদা, ৫/৯১)। আর মোবাইলে গেমস খেলাও এমনি, কাজেই তা অবৈধ। বুরায়দা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দাবা খেলল, সে যেন তার হাতকে শূকরের রক্ত-গোশত দ্বারা রঞ্জিত করল' (ছহীহ মুসলিম, হা/২২৬০; মিশকাত, হা/৪৫০০)। উল্লেখ্য যে, হাদীছে বর্ণিত শব্দ 'নারদেশীর' দাবার সাথে সীমাবদ্ধ নয়। বরং যেসব খেলাধুলায় সময়ের অপচয় হয় তার সবগুলো নারদেশীরের অন্তর্ভুক্ত যা স্পষ্ট হারাম। তাছাড়া তিনটি খেলা ছাড়া সকল প্রকারের খেলা যা লোকেরা খেলে থাকে তা অন্যায় ও বাতিল- ১. ধনুকের সাহায্যে তীর নিক্ষেপ করা। ২. ঘোড়ার প্রশিক্ষণ ও ৩. স্ত্রীর সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করা। এগুলো শরীআতে বৈধ ও স্বীকৃত (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭৩৩৮; দারেমী, হা/২৪০৫ তিরমিযী, হা/১৮৩৭; ইবনু মাজাহ, হা/২৮১১; মিশকাত, হা/৩৮৭২)।

**প্রশ্ন (৪৫) : স্বামী-স্ত্রী যতবার মিলন করবে ততবার কি ফরয গোসল করতে হবে? যদি করতেই হয় তাহলে শীতকালে কী করতে হবে?**

- সাঈদ হোসেন

সাতক্ষীরা।

**উত্তর :** স্বামী স্ত্রী একাধিকবার মিলন করলেও শেষে একবার গোসল করলেই সেটি যথেষ্ট হবে। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একই গোসলেই তার সকল স্ত্রীর কাছে যেতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৩০৯)। তবে একাধিকবার মিলন করতে চাইলে দুই মিলনের মাঝে ওযূ করা মুস্তাহাব। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে তারপর আবার মিলিত হবার ইচ্ছা করবে সে যেন ওযূ করে নেয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/৩০৮)।

**প্রশ্ন (৪৬) : জনৈক ব্যক্তির ব্যাপারে পূর্বে অনেক গীবত করা হয়েছে। তবে তিনি এখন বেঁচে নেই। তার ব্যাপারে গীবত করার কারণে উক্ত পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য বর্তমানে করণীয় কী?**

-রবীউল ইসলাম

চাঁদমারী, পাবনা।

**উত্তর :** গীবত বান্দার সাথে জড়িত পাপ। বান্দার সাথে জড়িত পাপ বান্দার কাছেই ক্ষমা চেয়ে নিতে হয়। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'কেউ যদি কারও প্রতি জুলুম করে থাকে সম্মান কিংবা অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে, তাহলে সে যেন আজই (দুনিয়াতেই) তা মীমাংসা করে নেয়, সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন কোনো দীনার বা দিরহাম (স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা) থাকবে না...' (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪৯; মুসনাদে আহমাদ, হা/১০৫৮০)। এখন যার গীবত করা হয়েছে, সে যদি মারা যায় তাহলে চেষ্টা করতে হবে, যার কাছে তার গীবত করা হয়েছে সে ব্যক্তির কাছে ওই মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করবে। তার নামে দান করবে ও

আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। আশা করা যায়, এসব পদ্ধতি অবলম্বন করলে ক্ষমা হতে পারে।

**প্রশ্ন (৪৭) : টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা অহংকারের লক্ষণ। প্রশ্ন হলো, কেউ যদি অহংকার না করে টাখনুর নিচে কাপড় পরে তাহলে কী সমস্যা আছে?**

- আসাদুল্লাহ, নওগাঁ।

**উত্তর :** অহংকারের উদ্দেশ্য হোক বা না হোক পুরুষের জন্য টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা হারাম। নবী ﷺ বলেছেন, পরিধেয় বস্ত্রের যে অংশ পায়ের গোড়ালির নীচে থাকবে, সে অংশ জাহান্নামে যাবে (ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৮৭)। নবী ﷺ বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির সাথে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে'। রাবী বলেন, একথাগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার বললেন। আবু যার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হোক, তারা কারা? তিনি বললেন, 'টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারী, কিছু দান করে অনুগ্রহ প্রকাশকারী এবং মিথ্যা কসম করে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়কারী' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০৬; মিশকাত, হা/২৭৯৫)। পূর্ববর্তী যুগে কোনো এক ব্যক্তিকে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানের জন্য আল্লাহ তাআলা তাকে মাটির নীচে দাবিয়ে দিয়েছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৮৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২০৮৮; মিশকাত, হা/৪৩১৩)। সুতরাং অহংকারবশতই হোক অথবা অংহকার ছাড়াই হোক সর্বাবস্থায় টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

**প্রশ্ন (৪৮): আমাদের এলাকাতে পাঁচ বছরের অথবা দশ বছরের জন্য আগাম চুক্তিতে আম বাগান বর্গা দেওয়া হয়, যেখানে যিনি বর্গা নিচ্ছেন তিনিই সেই বাগানের দেখাশোনা করা, সেচ দেওয়া ইত্যাদি কাজগুলো করে থাকেন। এখন প্রশ্ন হলো, এভাবে আগাম চুক্তিতে আম বাগান বর্গা দেওয়া কি জায়েয?**

-আমিনুল হক, রাজশাহী।

**উত্তর:** এভাবে বাগান বর্গা দেওয়া বৈধ নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিক্রয়কারী ও ক্রেতাকে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন যতদিন পর্যন্ত গাছের ফল (খাবার বা কাজে লাগানোর) উপযুক্ত না হবে (ছহীহ বুখারী, হা/২১৯৪, ছহীহ মুমলিম, হা/১৫৯৪)। কারণ এতে ধোঁকার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এটি সম্পদের মালিকানা অর্জনের পূর্বেই তা বিক্রি করার আওতাভুক্ত যেগুলো ইসলামী শরীআতে জায়েয নয় (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫১৩)। সুতরাং রাসূল ﷺ বলেন, 'বলো তো, আল্লাহ তাআলা যদি ফল নষ্ট করে দেন, তবে কিসের বিনিময়ে তোমার ভাইয়ের মাল গ্রহণ করবে'? (বুখারী, হা/২২০৮; মুসলিম, হা/১৫৫৫) । সুতরাং এধরনের বাগান বর্গা দেওয়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

**প্রশ্ন (৪৯) : বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাততালি দেওয়ার বিধান কী?**

-ইউসুফ
দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

**উত্তর:** হাত তালি দেওয়া একটি জাহেলী প্রথা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'কাবাগৃহে তাদের ছালাত বলতে ছিল শুধু শিস দেওয়া ও হাততালি দেওয়া' (আনফাল, ৮/৩৫)। সুতরাং শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রেই নয়; বরং ইবাদতের বাইরেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান, খেলাধুলা কিংবা আনন্দদায়ক কোনোকিছু দেখে হাততালি দেওয়া জায়েয নয়। কারণ এতে জাহেলী যুগের মুশরিক ও বর্তমান যুগের অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্যতা অবলম্বন করা হয়। যা বর্জন করা আবশ্যক। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্যতা গ্রহণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত' (মুসনাদে আহমাদ, হা/৫১১৫; আবুদাঊদ, হা/৪০৩১; মিশকাত, হা/৪৩৪৭)।

## মীরাছ

**প্রশ্ন (৫০) : এক ব্যক্তি তার স্ত্রী ও দুই মেয়ে রেখে মারা গেছেন। তার কোনো পুত্র সন্তান নেই। আর তার ভাই বোন আছে। এখন মৃত ব্যক্তির সম্পদ কীভাবে বণ্টন করা হবে?**

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
নারায়ণগঞ্জ।

**উত্তর :** এক্ষেত্রে মেয়েরা মৃতের সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'শুধু কন্যা দুইয়ের বেশি থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুইভাগ, আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধেক (আন-নিসা, ৪/১১)। আর যেহেতু মৃতের সন্তান রয়েছে, তাই স্ত্রী পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের (স্ত্রীদের) জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ' (সূরা আন-নিসা, ৪/১২)। আর বাকী সম্পদ মৃতের ভাই-বোনেরা আছাবা হিসেবে পাবে। তাদের মাঝে পুরুষের জন্য মেয়ের দ্বিগুণ এভাবে ভাগ করতে হবে।

BONOJO

Organic BONOJO™

bonojobd.com
01704550806
/bonojobd

সুন্দরবনের
খলিশা ফুলের মধু

দেবহাটা, সাতক্ষীরা
অর্ডার করতে ফেসবুক পেজে ম্যাসেজ দিন

চাষের নয়, প্রাকৃতিক মধু

মাকতাবাতুস সালাফ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত ও পরিমার্জিত বইসমূহ

মূল্য ৫০ টাকা

ইসলামে জামাআত বলতে কোন দলকে বুঝায়

আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

মূল্য ৬০ টাকা

প্রশ্নোত্তরে সহজ আক্বীদা শিক্ষা

আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

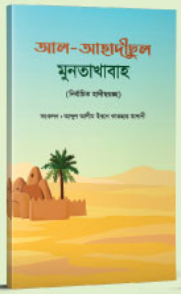


মূল্য ৩০ টাকা

আল-আহাদীছুল মুনতাখাবাহ
(নির্বাচিত হাদীছগুচ্ছ)

আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

মূল্য ১৫ টাকা

সলাতে মাসবুকের বিধি-বিধান

আব্দুল বারী বিন সোলায়মান
সম্পাদনায় :
শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

মূল্য ৫০ টাকা

আহলেহাদীছদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও তার জবাব

আকতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান
সম্পাদনায় :
শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক যোগাযোগ : মাকতাবাতুস সালাফ
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী ।

অর্ডার করুন
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৪৭

بسم الله الرحمن الرحيم

# নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন



**আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ**
**জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য :**

Ac/Name : Al Jamiah As Salafiya General Fund
Ac/No : 20501130204367701
Islami Bank Bangladesh Ltd. Rajshahi Branch

Ac/Name : Al Jamiah As Salafiya Zakat Fund
Ac/No : 20501130204367701
Islami Bank Bangladesh Ltd. Rajshahi Branch



**মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য**
**বায়তুল হামদ জামে মসজিদ, রাজশাহী ও নারায়ণগঞ্জ**

Ac/Name : Baitul Hamd Jame Masjid Complex Fund
Ac/No : 20501130204367316
Islami Bank Bangladesh Ltd. Rajshahi Branch

**দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য :**

Ac/Name : Nibras Yatim Kollan Fund
Ac/No : 20501130204367600
Islami Bank Bangladesh Ltd. Rajshahi Branch



**পত্রিকা ও বই ফ্রি বিতরণ এবং দাঈ**
**নিয়োগসহ বিভিন্ন দাওয়াহ কার্যক্রমের জন্য :**

Ac/Name : Al-Itisam Dawah Fund
Ac/No : 20501130204367702
Islami Bank Bangladesh Ltd. Rajshahi Branch



**মানব সেবামূলক কার্যক্রমের জন্য**
**ত্রাণ সহায়তা, অক্সিজেন বিতরণ, শীতবস্ত্র বিতরণ :**

Ac/Name : Nibras Tran Tahbil Fund
Ac/No : 20501130204367903
Islami Bank Bangladesh Ltd. Rajshahi Branch

Swift Code : IBBLBDDH113
Routing No: 125811932

**সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭**

| bKash | রকেট পারসোনাল | bKash এজেন্ট | নগদ |
|---|---|---|---|
| 01717-088967 | 01835-984648-7 | 01793-638180 | 01717-088967 |
| 01835-984648 | 01784-213178-5 | 01904-122546 | 01835-984648 |
| 01773-925235 | | | 01407-021800 |

bKash মার্চেন্ট : 01974-088967 (বিকাশের ৪ নং অপশান থেকে পেমেন্ট করতে হবে)

# নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭